ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল আযীয

সম্পাদনা

আকরাম ফারূক

শতাব্দী প্রকাশনী

শপ্র : ৪৩

ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ISBN 984-645-010-3

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

ফোন ৮৩১১২৯২

১ম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯ ইং

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০০২

শব্দ বিন্যাস

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণে

আল্ ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Islami Ebadoter Mormokotha by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Published by Shotabdi Prokashani, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Elephant Raod, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 8311292, 1st Edition : April 1989, 4th Printig : November 2002.

Price : Tk. 30.00 Only.

আমাদের কথা

ইসলামের ইবাদতসমূহ নিছক কোনো অনুষ্ঠান সর্বস্ব পূজা উপাসনা নয়। বরঞ্চ তা একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণের দাবি করে, তেমনি অপর দিকে তার অনুশীলন করা বা না করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জীবনের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা। কিন্তু ইবাদতের সঠিক তত্ত্ব ও মর্ম উপলব্ধি ছাড়া তার যথার্থ অনুসরণ ও অনুশীলন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মাওলানা মওদূদী র. এ পুস্তিকায় ইসলামী ইবাদতের অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্যের নিখুঁত চিত্র অংকন করেছেন। কিন্তু দু:খের বিষয় পুস্তিকার এ অংশে তিনি কেবল ইসলামী ইবাদতের নামায ও রোযার বিষয়েই আলোচনা করে যেতে পেরেছেন। যাকাত এবং হজ্জ সম্পর্কে লেখার অবকাশ আর তিনি পাননি। আমরা আশা করি, এই ক'টি পৃষ্ঠাই সুধী পাঠকের আত্মোপলব্ধিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে।

ঢাকাস্থ মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানার সমুদয় গ্রন্থাবলী বাংলাভাষী পাঠকদের খেদমতে হাযির করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ পুস্তিকাটি সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতারই একটি কড়ি। পুস্তিকাটি অনুবাদ করেছেন একাডেমীতে কর্মরত রিসার্চ স্কলার মুহাম্মদ আবদুল আযীয এবং সম্পাদনা করেছেন হাফেয আকরাম ফারূক। কোনো বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টিতে অনুবাদে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং তিনি যদি মেহেরবানী করে আমাদের জানান, তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশায়াল্লাহ।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের ভূমিকা

যে বিষয়টি নিয়ে এ পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এর আগেই আমার খুতবাত গ্রন্থে আলোকপাত করেছি। তবে সেখানে আমার বক্তব্য ছিলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, যারা সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তাই সেখানে বক্তব্যকে সহজ সরল আলোচনা পর্যন্তই সীমিত রাখতে হয়েছিল। অতঃপর শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও অনুসন্ধানী মনের লোকদের জন্যে এ বিষয়ে একটি পৃথক পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যাতে করে ইবাদতের গভীর তাৎপর্য ও মর্মার্থ তাদের সম্মুখে পেশ করা সম্ভব হয়।

এখন এ বিষয়ে যাকিছু লেখা হলো, যদিও তাতে আরো অনেক কিছু সংযোজন করার অবকাশ রয়েছে এবং এতে ইবাদতের অন্তর্নিহিত সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, তবু আমি আশা করি, এখানে যা কিছু আরয করা হয়েছে, তা অধিকাংশ জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজনের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে যথেষ্ট হবে।

এ পুস্তিকায় শুধুমাত্র নামায ও রোযা সম্পর্কে দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এখনো যাকাত এবং হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা বাকী রয়েছে। সেজন্যে সময় বের করার অপেক্ষায় আছি।

যা কিছু এখনো লেখার বাকী আছে সেটার অপেক্ষায় যতোটুকু এ যাবত লেখা হয়েছে, সাথী বন্ধুরা তার প্রকাশনা বন্ধ না রাখার দাবি জানাচ্ছেন। তাই এ কটি পৃষ্ঠা এ পুস্তকের প্রথম খন্ড হিসেবে পাঠকদের উপহার দেয়া হলো।

আবুল আ'লা

১

ইবাদতের তত্ত্বকথা

কুরআনের আলোকে ইবাদত হলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ. (الذاريات : ٥٦)

অর্থ ঃ জীন ও মানুষ জাতিকে আমি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আননাযিয়াত ঃ আয়াত ৫৪)

বস্তুত মানব জাতিকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নবীদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি।

اَنِ اعْبُدُو اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ. (النحل : ٣٦)

অর্থ ঃ আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করো এবং খোদাদ্রোহী শক্তি থেকে দূরে থাকো।' (সূরা আননহল ঃ আয়াত ৩৬)

ইবাদতের উদ্দেশ্য কি এবং ইসলাম আমাদের ওপর যেসব ইবাদত ফরজ করে দিয়েছেন, সেগুলোর মূলতত্ত্বই বা কি, তা জানা আমাদের জন্যে খুবই জরুরী। যদি আমরা এসব বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যাই, তাহলে যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পূরণ করতে আমরা হবো অসমর্থ।

ইবাদতের অনৈসলামী ধারণা

ইসলামে ইবাদত বলতে নিছক পূজা উপাসনা বুঝায়না, বরং দাসত্ব ও আনুগত্যও বুঝায়। ইবাদতের অর্থ নিছক পূজা পার্বণ ও বন্দনা প্রার্থনা মনে করা প্রকৃতপক্ষে নিরেট অজ্ঞতা সুলভ ও অনৈসলামী ধারণা। ইসলামের জ্ঞান বিবর্জিত ও অন্ধ জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত লোকদের স্বভাব এই যে, তারা আপন উপাস্য দেব-দেবীকে মানুষের সাথে তুলনা করে থাকে। তারা মনে করে যে, সমাজের নামীদামী লোকেরা, রাজা কিংবা নেতারা যেমন তোষামোদ দ্বারা খুশী হয়, নজরানা, দক্ষিণা ও উপঢৌকনাদি পেলে দয়ার্দ্র

স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ আসল হুকুমদাতার বিধান ও মর্জি অনুযায়ী প্রয়োগ করা। যে বান্দাহ পার্থিব জীবনে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে যতোবেশি তৎপর ও অধ্যবসায়ী হবে, নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে যতোবেশি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে স্বীয় মনিবের আইন কানুন অনুসরণ করবে, ততোবেশি সে সফলকাম হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময়সীমা পার হওয়ার পর যখন সে মনিবের দরবারে হিসাব নিকাশের জন্যে হাজির হবে, তখন তার ইহলৌকিক জীবনের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নিজেকে একজন কর্তব্যপরায়ণ, অনুগত ও ফরমাবরদার, বান্দাহ হিসেবে প্রমাণ করতে পারে কিনা, তার ওপরই তার ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে সে যদি প্রমাণ করে যে, সে অলস, কর্মবিমুখ, দায়িত্ববোধহীন অথবা বিদ্রোহী ও অবাধ্য ছিলো, তবে তার উন্নতি ও সাফল্য সুদূরপরাহত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শুরুতে বর্ণিত ইবাদতের দু'টি ধারণাই ভুল। যে ব্যক্তি নিজের সমগ্র জীবনের কিছুমাত্র সময় আল্লাহর উপাসনার জন্যে আলাদা করে এই সামান্য সময়ের মধ্যে ইবাদতের কতিপয় বিশেষ রসম ও রেওয়ায আদায়পূর্বক মনে করে 'আমি আল্লাহর হক আদায় করেছি, এবার আমি মুক্ত এখন আমার জীবনের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান যেভাবে খুশী সম্পন্ন করবো।' তার যথার্থ স্বরূপ একটি উদাহরণের মাধ্যমে পেশ করা যায়। যেমন, আপনি একজন চাকরকে রাতদিন ২৪ ঘন্টার জন্যে নিয়োগ করলেন, তাকে পুরো মাহিনা দিয়ে লালন করে যাচ্ছেন। এদিকে চাকরটি সকাল সন্ধ্যায় এসে আপনাকে নতশিরে কুর্নিশ করে যায়, তারপর যথাইচ্ছা যেখানে সেখানে ঘোরা ফেরা করে, অথবা যার ইচ্ছা তার ভৃত্যগিরি করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কোণে গিয়ে বসে নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ পড়ায় নিজের সমস্ত সময় ব্যয় করে, তার উদাহরণ সেই লোকটির মতো, যাকে আপনি বাগানের রক্ষ'ণাবেক্ষণের জন্যে নিয়োগ করলেন, কিন্তু লোকটি বাগানের দেখাশুনা ছেড়ে দিয়ে আপনার সামনে সব সময় হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত 'মনিব মনিব' বুলি জপতে থাকে। উদ্যানের কাজ সম্পর্কে আপনি তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাকে সে অত্যন্ত মধুর সুরে এবং সঠিক উচ্চারণসহ কেবল আবৃত্তিই করতে থাকে। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী বাগানের উন্নতি ও শোভা বর্ধনের কোনো কাজই করেনা। এমন ভৃত্য সম্পর্কে আপনি যাকিছু অভিমত পোষণ করবেন, ঐ ধরনের ইবাদতকারীদের সম্পর্কে ইসলামের অভিমত হুবহু তদ্রূপ। এমন

প্রকৃতির ভৃত্যদের সাথে আপনার আচরণ যেরূপ হবে, উক্ত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ইবাদতকারীদের সাথে আল্লাহর আচরণও সেইরূপ হবে।

ইবাদত সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো, আপনার গোটা জীবন আল্লাহর বন্দেগীতে ব্যয়িত হবে। আপনি নিজেকে একজন সার্বক্ষণিক ভৃত্য মনে করবেন (Whole time servant). আপনার জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্ত হবেনা। এই দুনিয়ায় আপনি যাকিছুই করবেন, তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই করবেন। আপনার নিদ্রা ও জাগরণ, খানাপিনা, চলাফেরা, মোটকথা সবকিছুই শরীয়তের বিধান অনুসারে হবে।[১] আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ

---

১. অধুনা এক ভদ্রলোক শরিয়তী বিধান (Moral law) এবং প্রাকৃতিক বিধানের (Physical law) পার্থক্যকে অস্বীকার করে এক বিভ্রান্তিকর প্রচারণার ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছেন। তার মতে, প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণের নামই নাকি আল্লাহর ইবাদত, সে অনুসরণ শরিয়তের বিধি মোতাবেক হোক বা না হোক। যারা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কার উদ্ভাবনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে, তারাও এই ভদ্রলোকের বিবেচনায় আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত এবং খাঁটি মুমিন ও আল্লাহর খলীফা হিসেবে গণ্য। উক্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে শরিয়তের বিধান মেনে চলা হোক বা না হোক, তাতে কিছুই আসে যায়না। এটা এমন মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা যে, এতে কুফরী ও যথার্থ ইসলাম, খোদাদ্রোহিতা ও যথার্থ ইবাদত এবং আল্লাহর চরম অবাধ্যতা ও প্রকৃত আনুগত্যের সার্টিফিকেট পেয়ে যেতে পারে। এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের মূল চেতনাকেই তা বিকৃত ও নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম। এই ভদ্রলোকটির এটুকুও জানা নেই যে, মানুষকে শরিয়তের বিধির অধীন প্রাকৃতিক নিয়মকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, তা শিক্ষা দেয়াই ইসলাম আগমনের মূল লক্ষ্য। মানুষকে যদি নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই কাজ করতে হতো তাহলে তা শিক্ষা দেয়ার জন্যে কোনো নবী ও কিতাব প্রেরণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন হতোনা নিছক প্রাণীসুলভ জৈব তাড়না ও সহজাত স্বভাবই সেজন্যে যথেষ্ট ছিলো। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে কাজ করাই যদি মানুষের করণীয় সাব্যস্ত হয়, তাহলে তো মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকেনা। যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে একটি বাঘ একটি বকরির ঘাড় মটকিয়ে রক্তপান করে থাকে, তেমনি একজন লোক অপর একজন লোকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হলে সেও দুর্বল লোকটির ঘাড় মটকে দিতে পারবে। প্রাকৃতিক বিধানে এটা হবে সম্পূর্ণ বৈধ বা স্বাভাবিক কাজ। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত অধিকতর শক্তিশালী জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে দাপটে বশীভূত করে নিলে সেটাও হবে প্রাকৃতিক আইনসিদ্ধ। এ মতবাদ মেনে নিলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা বরং হিংস্র পশুর স্তরে নেমে আসে। মানুষের এহেন পাশবিকতাকে ইসলামে আল্লাহর ইবাদত বলে ঘোষণা করার প্রশ্নই ওঠেনা।

করেছেন, সেসব বন্ধনে আপনি নিজেকে আবদ্ধ করবেন এবং তিনি যে পদ্ধতিতে এই সম্পর্ক ছিন্ন কিংবা বজায় রাখার আদেশ করেছেন, সেভাবেই তা বজায় রাখবেন কিংবা ছিন্ন করবেন। আল্লাহ্ যেসব কাজ আপনার উপর অর্পণ করেছেন, পার্থিব জীবনে আপনার ওপর যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, সেগুলোর দায়িত্ব আপনার মনের পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ পালন করতে হবে। প্রতি কাজে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সামনে আপনার জবাবদিহির কথা স্মরণ রাখুন। মনে রাখবেন, আপনার প্রতিটি কাজের হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। ঘরে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র পরিজনদের সাথে, মহল্লায় প্রতিবেশীদের সাথে, সমাজে বন্ধুবান্ধবদের সাথে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আচার আচরণ করার সময় প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখার খেয়াল আপনাকে রাখতে হবে। রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে অপরাধ করার দুর্লভ সুযোগের সময়ও আপনাকে মনে রাখতে হবে, আর কেউ না দেখুক আল্লাহ্ আপনাকে দেখছেন। গহীন বনে, যেখানে অপরাধ করলে বাধা কিংবা সাক্ষ্য দেয়ারও কেউ নেই, সেই অবস্থায়ও আল্লাহর ভয়ে আপনাকে হতে হবে প্রকম্পিত এবং বিরত থাকতে হবে পাপাচার থেকে। মিথ্যা, বেঈমানী ও অত্যাচার করে প্রচুর ফায়দা লাভ করার আপনার অবাধ সুযোগ রয়েছে, আপনাকে বাধা দেয়ার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই, সে অবস্থায়ও আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে ফায়দার ওপর পদাঘাত করুন। সততা ও ঈমানদারীতে যখন সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা, তখনও তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে বিধায় তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

কাজেই দুনিয়া বর্জন করে কোনো এক প্রান্তে নির্জনে বসে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করার নাম ইবাদত নয়। বরং দুনিয়ার ঝামেলায় জড়িত হয়ে, জাগতিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব বহন করে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করার নাম ইবাদত। যিকরে ইলাহীর অর্থ এ নয় যে, মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মহড়া দেয়া হবে। বরং প্রকৃত যিকরে ইলাহী হলো, যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ থেকে উদাসিন করে তুলে সেগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও আল্লাহ থেকে গাফিল না হওয়া। পার্থিব জীবনে সেখানে আল্লাহর বিধান ভংগ করার অসংখ্য সুযোগ এবং তা অনুসরণে বড় বড় ক্ষতির ঝুঁকি দেখা দেয়, সেখানেও আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর বিধান অনুসরণে অবিচল থাকা চাই।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মনে রাখুন, আপনি জনগণের খোদা নন বরং খোদার একজন বান্দাহ। বিচারকের আসনে সমাসীন হয়ে অত্যাচার ও

অবিচার করার পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, 'আমি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি।' ধনরত্নের মালিক হয়ে আপনাকে মনে রাখতে হবে, 'আমি এগুলোর মালিক নই, আমানতদার মাত্র। কড়ায় গন্ডায় এগুলোর হিসাব কাল কিয়ামতের ময়দানে প্রকৃত মালিকের কাছে আমাকে দিতে হবে।' সেনাপতি হন, কিন্তু আল্লাহভীতি যেনো আপনাকে শক্তির নেশায় মাতাল হওয়া থেকে রক্ষা করতে থাকে। রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনার মতো কঠিন কাজ হাতে নিন, তারপর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার শাশ্বত বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিন। ব্যবসা, অর্থ ও শিল্প কারখানার মালিক হন, তারপর সফলতার উপকরণগুলোর মধ্যে পাক নাপাকের পার্থক্য বজায় রেখে চলতে থাকুন। প্রতি পদক্ষেপে সহস্র মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন চেহারা আপনার সামনে উপনীত হবে, তথাপি আপনার চলার গতিতে যেনো পদস্খলন ঘটতে না পারে। অত্যাচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও পাপাচারের সমস্ত পথ সবদিক থেকে আপনার সামনে উন্মুক্ত, জাগতিক জীবনের সফলতা, পার্থিব ভোগবিলাসের উপকরণ সমূহ প্রত্যেক পথের মাথায় দাঁড়িয়ে আপনাকে প্রচন্ডতম প্রলোভনের হাতছানি দেবে, তারপরও আল্লাহর স্মরণ এবং আখিরাতের ভয় আপনার কদমকে অবিচল রাখবে। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে যদি দেখা দেয় সহস্র গঞ্জনা, সত্যের ওপর দৃঢ় থাকতে এবং সত্য আল্লাহর আইনের অনুসরণ করা যদি হয় দ্যুলোক ভূলোকের বৈরিতার ঝুঁকি নেয়ার নামান্তর, তবুও দুরু দুরু কাঁপবেনা আপনার বুক, নতো হবে না আপনার চির উন্নত শির। আর এরই নাম প্রকৃত ইবাদত। এরই নাম আল্লাহর স্মরণ। একেই বলে যিকরে ইলাহী। আর এরূপ যিকর সম্পর্কেই আল্লাহর বাণী হলো ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (الجمعة : ١٠)

অর্থ ঃ নামায আদায় করার পর যমীনে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ বা যিকর করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা জুমা আয়াত ঃ ১০)

আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়

ইসলাম আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্যেও এই পথই নির্দেশ করেছে। মানুষ আল্লাহকে বনে জংগলে, পাহাড় পর্বতে কিংবা বৈরাগ্য

সাধনার নিঝুম প্রান্তে খুঁজে পাবেনা। তাঁকে পাওয়া যাবে মানুষেরই মাঝে, পার্থিব জীবনের শতসহস্র কোলাহলের অভ্যন্তরে। এখানে তাকে এতো কাছে পাওয়া যাবে, যেনো তাকে দিব্যি চোখে অবলোকন করা হচ্ছে। হারাম পথের সহস্র ফায়দা, অত্যাচার করার অবারিত সুযোগ এবং পাপ পংকিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকাকে আল্লাহর ভয়ে যে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে, তার আল্লাহ্ প্রাপ্তি হয়ে গেছে। তিনি প্রতি পদক্ষেপে নিজ প্রভুকে কাছে পাচ্ছেন বরং দিব্যি চোখে দেখছেন। যদি না পেতেন, না দেখতেন তাহলে এমন দুর্গম ঘাঁটি কেমন করে নিরাপদে অতিক্রম করতে সক্ষম হতেন? যে ব্যক্তি নিজ গৃহে আনন্দের মুহূর্তগুলোতে এবং কারবারের শত কোলাহলের মধ্যে 'আল্লাহ আমার থেকে দূরে নয়' এই অনুভূতি নিয়ে প্রতিটি কাজ করছে, সে আল্লাহকে প্রতি মূহূর্তে নিজের অতি কাছে পেয়েছে। যে ব্যক্তি রাজনীতি, রাজ্যশাসন, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং অর্থনীতি ও শিল্পব্যাবসার মতো কঠিন ক্ষেত্রে ঈমানের কঠোর পরীক্ষামূলক কাজ করেছে এবং এসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার সকল অবৈধ উপায় পায়ে দলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ওপর অবিচল রয়েছে, তার চেয়ে বড় মজবুত এবং খাঁটি ঈমান আর কার হতে পারে? আল্লাহর মা'রিফাত তার চেয়ে বেশি আর কে অর্জন করতে পেরেছে? এমন লোকটি যদি আল্লাহর অলী এবং নৈকট্যলাভকারী বান্দাহ্ না হবে, তাহলে আর কে হবে?

ইসলামের দৃষ্টিভংগিতে মানুষের আত্মিক শক্তি বিকাশের এটাই উপায়। আত্মিক উন্নতি এর নাম নয় যে, আপনি পাহলোয়ানের ন্যায় শারীরিক কসরত করে স্বীয় ইচ্ছা শক্তিকে (Will power) বাড়াবেন এবং সেই শক্তিতে কাশ্‌ফ কারামতের কলাকৌশল প্রদর্শন করতে থাকবেন। বরং আত্মিক উন্নতি হলো স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখা, নিজের মনমানস ও শরীরের সমস্ত শক্তিকে সঠিক কাজে লাগানো এবং স্বীয় আচার আচরণে আল্লাহর চরিত্রের কাছাকাছি হতে চেষ্টা করার নাম। পার্থিব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই পরীক্ষাক্ষেত্র। যদি আপনি এই পরীক্ষাক্ষেত্রে পাশবিক ও শয়তানী কর্মপদ্ধতি পরিহার করে চলেন এবং নিখুঁত বাছবিচার ও চেতনা সহকারে মানুষ্যত্বের সুমহান মর্যাদার সাথে সঙ্গতিশীল কর্মপন্থায় অবিচল থাকেন, তাহলে আপনার মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকবে। আর আপনিও দিন দিন আল্লাহর নিকটতর হতে থাকবেন। বস্তুত এছাড়া অন্য কিছুর নাম আত্মিক উন্নতি নয়।[১]

---

১. 'রূহারক্কী তরক্কী' বা আধ্যাত্মিক উন্নতির বুলি অনেকেই আওড়ায়। অথচ 'রূহানিয়্যাত' বা আধ্যাত্মিকতা বলতে কি বস্তুকে বুঝায়, তা তারা নিজেরাই জানেনা। এ কারণে তারা সারাটি জীবন একটি প্রচ্ছন্ন অজানা বস্তুর অনুসন্ধান ও অর্জন করার চেষ্টায় মত্ত থাকে। আর এতো চেষ্টা সাধনার পরও তারা কোথায়

ইসলামে প্রথা সর্বস্ব ইবাদতের মুল্য কতোটুকু?

উপরোক্ত আলোচনা ইবাদত সম্পর্কে ইসলামী ধারণার সারমর্ম। ইসলাম চায় মানুষের পার্থিব জীবনের পুরোটাকেই ইবাদতে রূপান্তরিত করে দিতে। ইসলামের দাবি মানব জীবনের এক মুহূর্তও যেনো আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অতিবাহিত না হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা ঘোষণা করার সাথে সাথে একথা অনিবার্য হয়ে দাড়ায় যে, মানুষ যে আল্লাহকে নিজের মাবুদরূপে স্বীকার করে নিয়েছে, আজীবন তাঁর 'আব্‌দ' বা বান্দাহ হয়ে থাকবে। আর এই বান্দাহ হিসেবে বেঁচে থাকার নামই ইবাদত। কথাটি উচ্চারণে বেশ ছোট্ট। খুব সহজে বলে দেয়া যায়। কিন্তু মানব জীবনের প্রতিটি দিককে বাস্তবে ইবাদতে রূপান্তরিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন কঠোর অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের। এ জন্যে প্রয়োজন বিশেষভাবে মানসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সুদৃঢ় চরিত্র গঠন, অভ্যাস ও স্বভাবসমূহকে একই ছাঁচে ঢেলে সাজানো। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের ওপর নির্ভর করলে চলবেনা, বরং এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সামগ্রিকভাবে সকল মানুষকে ইবাদতের জন্যে তৈরি করতে পারে এবং সেখানে সামষ্টিক শক্তি ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক এবং সকল ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম। ইসলাম নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত জাতীয় ইবাদতগুলো ফরজ করার উদ্দেশ্য এটাই। এগুলোকে ইবাদত নামে আখ্যায়িত করার অর্থ এটা নয় যে, ইবাদত হিসেবে এগুলোই যথেষ্ট। বরং এর তাৎপর্য হলো, এসব ইবাদত মূল ইবাদতের জন্যে মানুষকে গড়ে তোলে মাত্র। এগুলো মানুষের বাধ্যতামূলক ট্রেনিং কোর্স। এই ট্রেনিং কোর্স দ্বারা কাংখিত সেই বিশেষ ধাঁচের মানসিকতার সৃষ্টি হয়, বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে ওঠে, সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস ও স্বভাবের মজবুত কাঠামো তৈরি হয় এবং সেই সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মিত হয় যা না হলে মানব জীবনকে কোনোভাবেই ইবাদতে ইলাহীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব

পৌছতে চেয়েছিল এবং কোথায় গিয়ে পৌছলো, এ সম্পর্কে তারা কিছুই বুঝতে পারেনা। অথচ 'রূহানিয়্যত' শব্দটির ওপর চিন্তা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'রূহ' বা আত্মা বলতে মানুষের আত্মাকেই বুঝানো হয়েছে, অন্য কারো 'রূহ' নয়। সুতরাং 'রূহানিয়াত' ইনসানিয়্যাত বা মানবতারই অপর নাম। মানুষ পাশবিক কামনার বন্ধন ছিন্ন করে পরিপূর্ণ মানবতার দিকে যতো বেশি এগিয়ে যাবে এবং মানবসুলভ চরিত্র ও গুণাবলীর সুষমামন্ডিত হয়ে আল্লাহর রেজামন্দির উন্নততর লক্ষ্যে পৌছার যতোটুকু সফল চেষ্টা করবে, ততোটুকু আত্মিক উন্নতি ও প্রগতি সে লাভ করবে।

নয়। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উক্ত চারটি জিনিস (নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত) ছাড়া আর কোনো উপকরণ নেই। একারণেই এগুলোকে ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ ঘোষণা করা হয়েছে।[১] অর্থাৎ এগুলো এমন স্তম্ভ, যার ওপর ইসলামী জীবনের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আসুন এবার আমরা দেখি, এর এক একটি স্তম্ভ ইসলামী জীবনের অট্টালিকাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষকে উপরোল্লিখিত বৃহত্তর সর্বব্যাপী ইবাদতের জন্যে কিভাবে তৈরি করে।

---

১. আগের টীকায় উল্লিখিত মহোদয় কালেমায়ে শাহাদত এবং চারটি ইবাদতকে ইসলামের রুকন হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। তার পরিবর্তে তিনি নিজের পক্ষ থেকে ইসলামের দশটি রুকন উদ্ভাবন করেছেন। এ ভদ্রলোক নিরেট মূর্খ। ইসলাম সম্পর্কেও তার কিছু জানাশুনা নেই। 'রুকন' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞ। এই পাঁচটি জিনিসকে কোন্ বিবেচনায় ইসলামের রুকন সাব্যস্ত করা হয়েছে এ জ্ঞানও তার নেই। এই পাঁচটি জিনিসের অনুপস্থিতিতে ইসলাম নামের কোনো বস্তু যে আদৌ থাকেনা, একথাটি তিনি বুঝতে অক্ষম। আরো দুঃখের ব্যাপার হলো, আল্লাহর নবী যেসব জিনিষকে আরকানে ইসলাম রূপে ঘোষণা করেছেন, এই ভদ্রলোক সেগুলোকে আরকানে ইসলাম মনে করেননা। তিনি নিজের মনগড়া দশটি আরকানকে ইসলাম ঘোষণা করার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। তার মতে ইসলাম যেনো আল্লাহর নবীর পেশকৃত দীনের নাম নয়। বরং কেমব্রিজের এই কারিগর যা বানাবে তার নাম। একদিকে এ ধরণের ভদ্রলোকদের ধৃষ্টতা অপরদিকে সাধারণ লোকদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার বাড়াবাড়ি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, এমন প্রকৃতির লোকদের নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে উঠে সেটাকে ইসলামী সংগঠন এবং ইসলামী নীতি নির্ধারণী নেতৃত্ব মনে করা হয়। তাদের মতে আমীরের আকীদা বিশ্বাস, ইলমে দীন এবং স্বভাবচরিত্র দেখার যেনো প্রয়োজন নেই। শুধু সংগঠন এবং নেতৃত্বের অবকাঠামোই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তা ওমর ফারুক রা.-এর অধীনে হোক কিংবা হিটলার ও মুসোলিনির অধীনে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এ যুগের ফিৎনা কি সাংঘাতিক।

২

নামায

স্মরণ করানো

সমগ্র মানব জীবনকে ইবাদতে রূপান্তরিত করার জন্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তুটির প্রয়োজন তা হলো মন মানসে একথার অনুভূতি সব সময় সজীব, সতেজ ও সক্রিয় থাকা যে, সে আল্লাহর বান্দাহ এবং দুনিয়াতে যাবতীয় কাজ তাকে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই করতে হবে। এই অনুভূতিকে বার বার জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলা একান্ত দরকার। কেননা, মানুষ প্রকৃতপক্ষে যার বান্দাহ বা যার গোলামী করছে, সে তো তার চোখের আড়ালে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে। পক্ষান্তরে, শয়তান নিজেই মানুষের নফসের মধ্যে উপস্থিত থেকে সদা বলতে থাকে, 'তুমি আমার বান্দাহ্।' দুনিয়াতে লক্ষ্য কোটি শয়তান চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করছে, তুমি আমার বান্দাহ। এই শয়তানগুলোকে মানুষ অনুভব করতে পারে, দেখতে পায়। নিত্য নতুন পদ্ধতিতে সে নিজের শক্তি উপলব্ধি করায়। আমি আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগি করা আমার উচিত নয়, এই অনুভূতি উল্লিখিত দ্বিগুণ চাপের কারণে মানুষের মগজ থেকে উধাও হয়ে যায়। এটাকে জীবন্ত ও সক্রিয় করে রাখার জন্যে আল্লাহর মহিমা শুধু মুখে স্বীকার করা অথবা নিছক একটি তত্ত্বকথা হিসেবে বুঝাই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হলো এটাকে বারবার সজীব ও সতেজ করা। আর এ কাজটিই সম্পাদন করে নামায। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই সব কাজের প্রথমেই নামায আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর দিনের বেলায় আপনি যখন স্বীয় কাজে নিমগ্ন হন, তখন শত ব্যস্ততার মধ্যেও সামান্য বিরতি দিয়ে দু'বার আপনাকে আলাদাভাবে ডেকে নেয়, যাতে বন্দেগি করার অনুভূতি যদি আবছা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা যেনো পরিষ্কার ও সজীব করা যায়। তারপর সন্ধ্যা বেলায় যখন বৈকালিক ভ্রমণ এবং আমোদ আহলাদের লগ্ন

আসে, তখন নামায আপনাকে আবার সাবধান করে দেয়, তুমি আল্লাহর বান্দাহ, শয়তানের নও। এরপর ঘনিয়ে আসে রাতের আঁধার। আভ্যন্তরীণ শয়তান এবং বাইরের শয়তানগুলো একযোগে বান্দাহকে পাপের পংকিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করার মানসে সারাদিন ওত পেতে থাকে। এমনি মুহূর্তে নামায আপনাকে আবারও সতর্ক করে দেয়, তোমার কাজ আল্লাহর বন্দেগি করা, শয়তানের নয়।

এই হলো নামাযের প্রথম উপকারিতা। এ কারণেই কুরআনে নামাযের ব্যাখ্যায় যিকর শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, যার অর্থ স্মরণ করানো। যদি নামাযে এছাড়া অন্য আর কিছুই না থাকতো, তাহলেও শুধু এই একটিমাত্র গুণের দরুন নামায রুকনে ইসলাম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হতো। কেননা, এই উপকারিতার গুরুত্বের উপর যতোবেশি চিন্তা করা যায় ততোবেশি এই প্রত্যয় জন্মে যে, এ ধরণের স্মরণ করানো ব্যতীত মানুষের আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে বাস্তবে টিকে থাকা অসম্ভব।

কর্তব্য পরায়ণতা

তারপর যেহেতু আপনাকে এ জীবনে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর অনেক হুকুম মানতে হয়, আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার আওতায় পালন করতে হয়, সুতরাং আপনার মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা সৃষ্টি হওয়াও জরুরী। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব প্রতিপালনের অভ্যাসকে মজ্জাগত করে নেয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি আদৌ জানেনা ফরজ বা কর্তব্য কাকে বলে আর এটা ফরজ হওয়ার অর্থই বা কি? সে যে কর্তব্য পালনে অনুপযুক্ত হবে তা সহজেই অনুমেয়। এরূপ যে লোক ফরজ বা কর্তব্যের অর্থ জানে, কিন্তু তার শিক্ষা দীক্ষা এমন নিকৃষ্ট মানের যে, কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্য পালনে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন লোকের চরিত্রের ওপর কখনো নির্ভর করা যায়না এবং কোনো কার্যকর দায়িত্বের উপযোগীও তাকে ভাবা যায়না। কাজেই যাদের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হবে, তাদের জন্যে কর্তব্যের অবগতি এবং আনুগত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

এর উপকারিতা ও সার্থকতা শুধু ততোটুকু নয় যে, সর্বক্ষণ কাজের লোক তৈরি হতে থাকবে, বরং কর্মঠ ও অকর্মণ্য লোকদের মধ্যে প্রতিদিন ছাঁটাই বাছাই হতে থাকবে। চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে কারা নির্ভরযোগ্য আর কারা নির্ভরযোগ্য নয়, সে পার্থক্যও উত্তরোত্তর প্রকট হতে থাকবে। সমস্ত বাস্তব দায়িত্বের জন্যে মানুষকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে যাচাই

করতে থাকা অবশ্য জরুরি। এতে করে অনির্ভরযোগ্য লোকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা সম্ভব হবে না।

সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্তব্য বুঝা এবং পালন করার ব্যাপারে কি কি পদ্ধতিতে অনুশীলন হয়ে থাকে, রাতদিন কতবার বিউগল বাজানো হয়, সেনাদেরকে এক জায়গায় সমবেত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাদের দ্বারা প্যারেড করানো হয়। এসব কেন করা হয়? এর প্রথম উদ্দেশ্য সেনাদের মধ্যে নির্দেশ পালনের অভ্যাস গড়ে উঠুক, তাদের মধ্যে কর্তব্য অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি হোক এবং একই নিয়ম ও শিক্ষাসহ কাজ করার গুণ সৃষ্টি হোক। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিদিন সেনাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকা, যারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছে, তাদের মধ্যে কে কাজের লোক আর কে অকর্মণ্য, এই পার্থক্য প্রতিদিন প্রকট হয়ে উঠে। বিউগল বেজে উঠার পরও যে অলস ও অথর্ব সৈনিক ঘরে বসে থাকে কিংবা নিয়মানুযায়ী নির্দেশের সাথে সাথে তৎপর হয়ে ওঠেনা, তাকে প্রথমেই সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়। কারণ সময়মতো কাজের জন্যে ডাক দিলে সে যে সাড়া দেবে, এমন ভরসা তার ওপর করা যায়না।

দুনিয়ার সেনাবাহিনীর জন্যে হয়তো বহু বছর পর একবার কাজের সময় এসে থাকে। এই কাজের জন্যে এতোটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যে, প্রতিদিন সেনাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামে যে সেনা নিয়োগ করা হয়, তাদের কাজ সব সময়ের জন্যে। তারা সদা কর্মচঞ্চল (on duty) থাকে। তাদের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্র সদা উত্তপ্ত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি লগ্নে তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, পৈশাচিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে হয় এবং শাহী ফরমান জারি করতে হয়। ইসলাম নিছক প্রত্যয়মূলক ব্যবস্থা নয়, বরং বাস্তব দায়িত্বও বটে। আবার বাস্তব দায়িত্বও এমন পর্যায়ের যে, তাতে নেই অবকাশ, অবসর ও বিনোদনের কোনো সময়। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা অনবরত বিরামহীন কাজ আর কাজ। এবার সেনাবাহিনীর উদাহরণ সামনে রেখে অনুমান করুন। এমন কঠোর কাজের জন্যে কতোবড়ো নিয়ম শৃংখলা, কতো কঠোর শিক্ষা এবং কতো কঠিন পরীক্ষার প্রয়োজন। যে সেনাবাহিনীর একজন লোককে এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়, তার জন্যে শুধুমাত্র বিশ্বাসের (creed) মৌখিক স্বীকৃতি কেমন করে যথেষ্ট হতে পারে? বিশ্বাসের স্বীকৃতি তো এই চাকরিতে প্রবেশ করার জন্যে প্রার্থী হওয়ার

ঘোষণামাত্র। এই ঘোষণার পর তাকে কঠোর শৃংখলার বন্ধনে আবদ্ধ করা একান্ত জরুরি। এই শৃংখলার মধ্যে অবস্থান করে সে ইসলামের যথার্থ কাজের মানুষ হতে পারে। আর যদি সে নিজেকে এই নিয়ম শৃংখলার বেড়িতে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত না থাকে, কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে অনীহা প্রকাশ করে এবং নির্দেশাবলীর প্রতি অনুগত হওয়ার জন্যে নিজের মধ্যে কোনো প্রস্তুতি না রাখে, তাহলে সে ইসলামের জন্যে একেবারেই অযোগ্য। আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্যে এরূপ অথর্ব লোকের কোনোই প্রয়োজন নেই।

এরূপ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য অর্জন করার অভিপ্রায়েই রাতদিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। প্রত্যহ বিউগল পাঁচবার বেজে উঠার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে আল্লাহর সৈনিকগণ চতুর্দিক থেকে দৌড়ে এসে জড়ো হতে পারে আর এতেই প্রমাণ হবে তাদের কর্তব্য সচেতনতার। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালন করতে প্রস্তুত থাকার। এ পদ্ধতিতে একদিকে সৈনিকদের ট্রেনিং হয়, অপরদিকে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য স্পষ্ট হতে থাকে। যারা বাধ্যতামূলকভাবে ও নিয়মিতভাবে এই আওয়াযের অনুসরণ করে এবং নিয়মানুযায়ী তৎপর হয়, তাদের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা, কার্যক্ষমতা, শৃংখলা এবং হুকুমের আনুগত্য করার গুণাবলীর ক্রমবিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, যারা আওয়ায শ্রবণ করার পরও নিজের জায়গায় বসে থাকে তাদের এরূপ কাজই প্রমাণ করে যে, হয় তারা কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, অথবা সচেতন ঠিকই কিন্তু তা আদায় করতে প্রস্তুত নয়। কিংবা যে কর্তৃপক্ষ (Authority) এটাকে ফরজ হিসাবে ঘোষণা করেছে, তাকেই স্বীকার করছেনা, অথবা তাদের মানসিক অবস্থা এতো অধঃপতিত যে, যাকে স্বীয় ইলাহ ও রব বলে স্বীকার করছে, তার প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করতে তারা তৈরি হয়। তারা যদিও ঈমানের দাবিদার, কিন্তু তাদের ঈমানের দাবি সত্য (True to their convictions) নয়, যা সত্য ও সনাতন সে মোতাবিক কাজ করতে কষ্ট স্বীকার করার মতো গুণ ও সামর্থ তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রথম অবস্থার দৃষ্টিতে তারা মুসলমান নয়, আর দ্বিতীয় অবস্থায় তারা এতোটা অকর্মণ্য যে, তারা ইসলামী সমাজে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য। একারণেই নামায সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ. (البقره : ٤٥)

অর্থ ঃ নিসন্দেহে (নামায) একটি কাজ। তবে নিষ্ঠাবানদের জন্যে কঠিন নয়।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৪৫)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে প্রস্তুত নয়, শুধু তাদের জন্যে নামায মস্তবড় বোঝা। অন্যকথায় নামায আদায় করা যাদের জন্যে কষ্টকর তারা মূলত আল্লাহর বন্দেগি ও আনুগত্য করতে তৈরি না থাকার প্রমাণ পেশ করছে।

একারণেই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ. (التوبة : ١١)

অর্থ ঃ যদি তারা কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই।' (সূরা আততাওবা ঃ আয়াত ১১)

অর্থাৎ নামায ছাড়া মানুষ ইসলামের ভ্রাতৃত্বে গণ্যই হতে পারেনা। এ বিষয়ে কুরআনে বক্তব্য এসেছে এভাবে ঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (البقره : ٢-٣)

অর্থ ঃ এই কিতাব এমন পরহেযগার লোকদের জন্যে হিদায়েত স্বরূপ, যারা গায়েব বা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযক থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২-৩)

এ কারণে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى. (النساء : ١٤٢)

অর্থ ঃ তারা নামাযে যদিওবা দাঁড়ায় তাতে এমনভাবে উসখুস করতে করতে অনিচ্ছাক্রমে দাঁড়ায়, যেনো তাদের আত্মা বের হওয়ার উপক্রম।' (সূরা আননিসা ঃ আয়াত ১৪২)

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ. (الماعون : ٥)

অর্থ ঃ তারা নামায আদায় করতে অলসতা করে।' (সূরা আল মাউন)

এই সম্পর্কে হাদিসের ভাষ্য এইরূপ ঃ

الفرق بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة. (مسلم)

অর্থ ঃ নামায ত্যাগ করাই বান্দাহ আর কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য।' (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

অর্থাৎ নামায ত্যাগ করা এমন একটি সেতু, যা অতিক্রম করে মানুষ ঈমান থেকে কুফরির দিকে ধাবিত হয়।

এ কারণেই বিশ্বনবী সা. বলেছেন, 'যারা আযানের শব্দ শুনার পরও ঘর থেকে বের হয়না, আমার মনে চায় তাদের ঘরগুলো গিয়ে জ্বালিয়ে দেই।'

এজন্যে তিনি বলেছেন ঃ

العهد بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر.

অর্থ ঃ আমাদের এবং আরবের বেদুইনদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত হলো নামায। যে এটাকে ছিন্ন করবে, সে কাফের বিবেচিত হবে এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে' (তিরমিযি, নাসাঈ)।

আজকাল আমাদের সমাজে ইসলাম সম্পর্কে যে নিদারুণ অজ্ঞতা বিরাজমান, তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারা নামাজের ধারই ধারেনা, আযানের শব্দ শুনেও শোনেনা, মুয়াযযিন কাকে কি উদ্দেশ্যে ডাকছে, সে অনুভূতি পর্যন্ত যাদের নেই, তারা মুসলমান নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এরূপ ধারণা আজকাল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইসলামে নামাযের তেমন আর কোনো গুরুত্ব নেই এবং নামায ছাড়াও মুসলমান থাকা যায়। এমনকি একজন বেনামাযী লোকের পক্ষে মুসলমানদের নেতা ও জাতির কর্ণধার পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যখন ইসলাম একটি জীবন্ত আন্দোলন হিসেবে সক্রিয় ছিলো, তখন তার এরূপ অবস্থা ছিলোনা। নিম্নোক্ত হাদিসটির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

كان اصحاب النبى صلعم لايرون شيئا من الاعمال تركه كفر غيرالصلوة. (ترمذى)

অর্থ ঃ নামায ব্যতীত আর কোনো পুণ্যকর্মকেই রসূল সা.-এর সাহাবীগণ এতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না, যা ত্যাগ করা কুফরির শামিল।' (তিরমিযি)

চরিত্র গঠন

নামাযের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা হলো, মানুষের চরিত্রকে এমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা, যা ইসলামী জীবন যাপন করার, অন্যকথায়

জীবনকে আল্লাহকে আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করার জন্যে জরুরি।

বিশ্বের সর্বত্র আপনি দেখতে পাবেন, কোনো দলকে যে ধরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে চরিত্র গঠনেরও একটি প্রশিক্ষণ নীতি তৈরি করা হয়। যেমন রাষ্ট্রীয় সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বস্ততার সাথে দেশের প্রশাসন পরিচালনা করা। সুতরাং প্রশাসনিক (Administration) দক্ষতা সৃষ্টি করার ওপরই সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হয়। সেখানে তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রশ্ন অবান্তর। ব্যক্তিগত জীবনে যতো জঘন্য স্বভাবেরই হোক, একটি লোক সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারে আবার উন্নতিও করতে পারে। কেননা সেখানে সত্য ও ন্যায়ের নীতিমালার আনুগত্য করা এবং নৈতিকতাকে রাজনীতির বুনিয়াদরূপে গড়ে তোলা আদৌ ইপ্সিত নয়। অনুরূপভাবে সেনাবাহিনী সংগঠিত করার উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ বিগ্রহের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। কাজেই কেবলমাত্র এ দৃষ্টিভংগিতেই সৈনিকদেরকে ট্রেনিং দেয়া হয়। মারপিটের জন্যে তাদেরকে তৈরি করা হয়, প্যারেড করানো হয়, যাতে করে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। তাদেরকে অস্ত্রের ব্যবহার শিখানো হয়, যাতে করে তারা যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ে দক্ষ হতে পারে। তাদেরকে হুকুম পালনে অভ্যস্ত করানো হয়, যাতে সরকার যখন যেখানে যে উদ্দেশ্যেই তাদের সহায়তা চায়, তা বিনা দ্বিধায় করতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো উন্নতমানের নৈতিক উদ্দেশ্য না থাকার কারণে সেনাবাহিনীর চরিত্রে খোদাভীতি সৃষ্টি করার ধারণা পর্যন্ত কারো মনে উদয় হয়না। সৈনিক যদি আইন শৃংখলার অনুসারী হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্যে সেটিই যথেষ্ট। তারপর সে ব্যভিচারী, শরাবখোর, মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র ও যালেম যাই হোকনা কেনো, তার কোনো তোয়াক্কা করা হয়না।

অপরদিকে ইসলাম এমন একটি জামায়াত বা সমাজ গঠন করতে চায়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা ও অন্যায়কে উচ্ছেদ করা। এই সমাজকে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, যুদ্ধ সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মোটকথা সংস্কৃতি ও তামাদ্দুনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার সুদৃঢ় নীতিমালার পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর বিধান চালু করতে হবে। এজন্যে সে কর্মীবাহিনী, সেনাবাহিনী ও অফিসারবৃন্দকে ভিন্ন একটি প্রশিক্ষণ নীতির অধীনে তৈরি করে যাতে করে বিশেষ ধরণের দায়িত্ব পালনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এ চরিত্রের বুনিয়াদ ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ ঃ যে মহান সত্তা আসমান ও যমীন বানিয়েছেন আমার মুখমণ্ডল আমি তাঁর দিকেই একনিষ্ঠভাবে ফিরিয়ে দিলাম। যারা আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্বে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে, আমি তাদের অন্তর্গত নই।'

অতঃপর আপনারা কান পর্যন্ত হাত উঠান। যেনো দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন।[১] তারপর আল্লাহু আকবর বলে হাত বাঁধেন।[২] যেনো এবার নিজের বাদশার সামনে করজোড়ে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন।

এরপর আপনারা কি নিবেদন করছেন?

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র।[৩] তোমার জন্যে যাবতীয় প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সবচেয়ে উচুঁ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ ঃ আমি অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ঃ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালকের জন্যে।'

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ '(তিনি) পরম দাতা ও দয়ালু।'

---

১. হাত উঠানো প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিসের পরিচয় বহন করে। একটি আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ অবাধ্যতা বর্জন করে নিজকে সোপর্দ করা। দ্বিতীয়টি হলো সংশ্রবহীন হওয়া অর্থাৎ যেসব বস্তুর সাথে মানুষের এ যাবত সম্পর্ক ছিলো, তা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া।

২. কারো সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো সর্বোচ্চ ভক্তি, আদব ও দাসসুলভ চরম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। এজন্যে প্রাচীনকালে রাজা বাদশাগণ এ প্রথাকে দরবারী রীতিরূপে গণ্য করতেন। কিন্তু ইসলাম এ প্রথা শুধুমাত্র আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে নির্ধারণ করেছে।

৩. পবিত্র অর্থ দোষত্রুটি, দুর্বলতা ও ভুল থেকে পবিত্র হওয়া। প্রশংসা ও স্তুতি তোমার জন্যে, অর্থাৎ তুমি সমস্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ 'প্রতিফল দিবসের মালিক।'

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ' আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও।'

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

অর্থ ঃ 'তাদের পথ, যাদের উপর তোমার করুণা বর্ষিত হয়েছে।'

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ.

অর্থ ঃ তাদের পথ নয়, যাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।'

اٰمِيْن । 'প্রভু, তুমি আমাদের দু'আ কবুল করো।'

তারপর আপনি কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করুন, আয়াতের প্রতি ছত্রে রয়েছে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, নৈতিক শিক্ষা দীক্ষার বাস্তব উপদেশাবলী এবং যে সহজ সরল পথ পাওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ আগে প্রার্থনা করেছিলেন, সে পথের পরিচয়। যেমন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ.

অর্থ ঃ সময়ের শপথ, (অর্থাৎ সময় একথার সাক্ষ্য যে) মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।'

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা ছাড়া।'

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. (العصر)

অর্থ ঃ আর যারা সত্য ও ন্যায়ের ওপর চলতে এবং তার ওপর অবিচল থাকতে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে, তারা ছাড়া।' (সূরা আসর)

এই সংক্ষিপ্ত ক'টি বাক্যে মানবগোষ্ঠীকে বলা হলো, 'তোমরা ধ্বংস ও অকৃতকার্যতা থেকে রক্ষা পাবেনা, যতোক্ষণ না আল্লাহর বন্দেগি এবং নেক কাজ অবলম্বন না করো। কেবলমাত্র একক বা ব্যক্তি পর্যায়ের সৎকর্মই যথেষ্ট নয়, বরং তোমার মংগলের জন্যে এও অপরিহার্য যে, তোমার সমাজ সত্য ও ন্যায়ের প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক। তোমার ইতিহাস এ সত্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

অথবা আপনি যেমন পাঠ করেন ঃ اَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

অর্থ ঃ যে প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে তুমি তাকে দেখেছো কি (সে কেমন লোক হয়ে থাকে?)'

এমন লোকই এতীমকে গলাধাক্কা দেয় ঃ

فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

অর্থ ঃ এবং গরীব মিসকীনকে নিজে খানা খাওয়ানো তো দূরের কথা, অপরকেও খাওয়ানোর জন্যে উদ্বুদ্ধ করেনা।'

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ. (الماعون)

অর্থ ঃ তাদের জন্যে আফসোস, যারা নামায আদায় করতে উদাসীন (পরকাল অস্বীকার করারই কারণে), আর আদায় করে তো নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর তারা (এমন সংকীর্ণমনা যে) নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটো খাটো জিনিসপত্রও অভাবী লোককে দিতে সংকোচ বোধ করে।' (সূরা মাউন)

এসব ছোটো ছোটো উদ্দীপনাময় বাক্যগুলো দ্বারা একথাই মানুষের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের নৈতিক জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে এবং এই আকীদায় বিশ্বাসী না হওয়ার দরুন মানুষের সামাজিক আচরণ এবং ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার কিভাবে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা থেকে শূন্য হয়ে যায়। অথবা

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ.

অর্থ ঃ পরিতাপ এমন প্রত্যেকটি লোকের জন্যে, যারা অন্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত এবং গাল দিয়ে বেড়ায়।'

الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَه.

অর্থ ঃ সে টাকাকড়ি জমা করে এবং বারবার গণনা করে।'

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ.

অর্থ ঃ সে মনে করে, তার টাকাকড়ি চিরদিন তার সাথে থাকবে।'

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ

অর্থ ঃ কখনো না, সে অবশ্যই একদিন হোত্বামায় নিক্ষিপ্ত হবে।'

وَمَاادْرٰكَ مَاالْحُطَمَةُ

অর্থ ঃ হোত্বামাহ কি জিনিস সে সম্পর্কে তুমি কি জান?'

نَارُاللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ

অর্থ ঃ আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন, যার শিখাসমূহ অন্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।'

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. (الهمزة)

অর্থ ঃ উঁচু উঁচু স্তম্ভের ন্যায় অগ্নিশিখা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে।' (সূরা হুমাযা)

এখানে মাত্র দু'তিনটি নমুনা তুলে ধরা হলো। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, প্রত্যেক নামাযে কুরআনের ন্যূনতম অংশ পাঠ করা কেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বস্তুত প্রত্যহ কয়েক বার আল্লাহর হুকুম আহকাম, তাঁর উপদেশাবলী ও তাঁর শিক্ষাসমূহ বার বার মানুষকে স্মরণ করানোই এর উদ্দেশ্য। এই পৃথিবী একটি কর্মক্ষেত্র। কাজ করার জন্যে মানব গোষ্ঠীকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এই কর্মস্থলটি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখার একমাত্র উপায় এই যে, কর্মব্যস্ততার মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্যে বিরতি দিয়ে মানুষকে কর্মক্ষেত্রের বাইরে আলাদা এক জায়গায় ডেকে সমবেত করতে হয়, যাতে এই কর্মক্ষেত্রে যে আইন ও বিধান (Instrument of Instruction) অনুসারে কাজ করতে হয়, তার ধারাগুলো তার স্মৃতিতে সজীব হতে থাকে।

এসব হেদায়াত পাঠ করার পরই আপনি আল্লাহু আকবর অর্থাৎ আল্লাহর মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়ে রুকু করেন। হাটুতে হাত রেখে স্বীয় বাদশার সামনে ঝুঁকে যান[১] এবং বার বার বলতে থাকেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ. 'আমার মহান প্রতিপালক পবিত্র।'

তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করলো তার কথা তিনি শুনলেন।'

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায়[২] লুটিয়ে পড়েন এবং বার বার বলতে থাকেন ঃ

---

১. নামাযের শুরুতে হাত উঠিয়ে নিজেকে সোপর্দ করার যে সূচনা করা হয়েছিলো, রুকু হলো সেই আত্মসমর্পণেরই আরো এক ধাপ অগ্রগতি।

২. এই সিজদা আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণ স্তর। এর অর্থ হলো, যে মস্তক আত্মম্ভরিতা, আত্মশ্লাঘা ও অহংকার ধারণ করে, বান্দাহ সে মস্তক আল্লাহর সমীপে ভূলুণ্ঠিত করলো। এ মস্তকে এখন আর স্বেচ্ছাচারিতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। বান্দাহ এবার পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর একজন 'অনুগত বান্দাহ' হিসেবে পরিগণিত।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى 'আমার শ্রেষ্ঠতম প্রভু পবিত্র।'

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাথা উঠিয়ে আদব সহকারে বসে নিম্নোক্ত কথাগুলো মুখে উচ্চারণ করেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ

অর্থ ঃ আমাদের সমস্ত সালাম, নামায ও ভালো কাজ আল্লাহর জন্যে।'

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ ঃ হে নবী! তোমার ওপর সালাম। আল্লাহর রহমত ও বরকত তোমার উপর বর্ষিত হোক।'

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ ঃ আমাদের এবং আল্লাহর সব নেক বান্দাহদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দাহ এবং রসূল।'

এই সাক্ষ্য দেয়ার সময় ডান হাতের শাহাদাত আংগুল উপরের দিকে উঠানো হয়, কেননা এটা নামাজে মুসলমানদের আকীদার ঘোষণা। শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করার সময় এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ হে দয়াময়! তুমি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের অনুসারীদের উপর অনুগ্রহ করো, যেভাবে অনুগ্রহ করেছো ইব্রাহিম ও ইবরাহীমের অনুসারীদের উপর। তুমি নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য এবং মহিমান্বিত গরীয়ান।'

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তুমি বরকত দাও মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের অনুসারীদেরকে, যেভাবে বরকত দিয়েছো ইব্রাহীমকে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মহিমান্বিত।'

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغْرَمِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মরণের ফিৎনা থেকে এবং ক্ষমা চাচ্ছি পাপ কাজ এবং অপরের হকের দায় দেনা থেকে।'

উপরোক্ত বাক্যগুলো রাতদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বার বার আওড়ানো হয়। তবে রাতে শোয়ার আগে সর্বশেষ নামাজের সর্বশেষ রাকাতে 'দোয়ায়ে কুনুত' নামে অপর একটি দোয়া পড়া হয়। এ দোয়া একটি মস্তবড় হলফনামা, যা একান্তে নীরব নিথর লগ্নে বান্দাহ তার প্রভুর সামনে এভাবে পেশ করে থাকে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে গুনাহের মাগফিরাত কামনা করি। তোমার ওপর ঈমান আনি, তোমার উপরই ভরসা করি। তোমারই সর্বোত্তম প্রশংসা করি, তোমার শুকরিয়া আদায় করি, তোমার (নিয়ামতের) নাশুকরী করিনা। যে তোমার নাফরমানী করবে, তার সাথে আমাদের নেই কোনো সম্পর্ক। পরওয়ারদিগার, আমরা কেবলমাত্র তোমার ইবাদত করি, তোমার জন্যেই নামায পড়ি, সিজদা করি, আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য একমাত্র তুমি। আমরা শুধু তোমার রহমতের প্রত্যাশী এবং তোমার আযাবকে ভয় করি। তোমার শাস্তি অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান লোকদের জন্যে অবধারিত।'

উপরোক্ত কথাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ইসলাম তার সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী এবং সমাজের প্রতিটি লোককে কি উদ্দেশ্যে

কোন্ লক্ষ্যে কি মনোভাব ও কি প্রেরণাসহ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, কিসব জিনিস তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিচ্ছে এবং কি ধরনের অভ্যাস সৃষ্টি করার প্রয়াসী, তা যে কোনো মানুষ নিজেই এ কথাগুলোর ভেতরে খুঁজে পেতে পারে। কেবলমাত্র প্যারেড দিয়ে গড়া সেনাবাহিনী ইসলামের কোনো কাজে আসেনা। নিছক প্রশাসনিক যোগ্যতার অধিকারী কর্মীবাহিনীরও মুখাপেক্ষী নয় ইসলাম। ইসলামে এমনসব সিপাহী ও কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, যাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার সাথে সাথে তাকওয়া পরহেজগারীও থাকবে। মরণপণ যুদ্ধের সাথে সাথে তারা মানুষের মন বদলাতে এবং নৈতিকতার পরিবর্তন সাধন করতেও সক্ষম। যারা কেবলমাত্র বিশ্ব পরিচালনাকারী নয় বরং বিশ্ববাসীর সংস্কার করতেও সমর্থ। এ দৃষ্টিভংগিতে দেখলে আপনার মন সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে নামায ছাড়া কিংবা নামাযের চেয়ে উত্তম অপর কোনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্ভব নয়। যারা এ পদ্ধতির অধীনে সঠিক প্রশিক্ষণ লাভ করতে সক্ষম শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকেই আশা করা যায় যে, আমানতদারী, দায়িত্বশীলতা, আল্লাহর হক ও বান্দাহর অধিকার সম্পর্কিত যে দায়দায়িত্ব পার্থিব জীবনে তাদের উপর অর্পিত হবে, তা পূর্ণ আল্লাহ ভীতিসহ নির্বাহ করতে সমর্থ হবে এবং চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও সেটা মোটেই ক্ষুন্ন হবেনা।

এ কারণেই কুরআনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. (العنكبوت)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।' (সূরা ঃ আনকাবুত)

এ কারণেই নামায আদিকাল থেকে ইসলামী আন্দোলনের অনিবার্য অংশরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবীর শরীয়তে নামায ছিলো সর্বপ্রধান রুকন। অতীতে ইসলামী আন্দোলন যখনই অধঃপতনের শিকার হয়েছে নামাযের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার কারণেই তা হয়েছে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. (مريم : ٥٩)

অর্থ ঃ তাদের পরে এমন অবাধ্য লোকদের আগমন ঘটে, যারা নামায নষ্ট করে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সুতরাং সত্বরই তারা পথভ্রষ্টতার অতল তলে তলিয়ে যাবে।' (সূরা ঃ মরিয়ম ঃ আয়াত ৫৯)

এর কারণ স্পষ্ট। ইসলামের শাশ্বত বিধান অনুযায়ী চলার জন্যে ইসলামী চরিত্রের প্রয়োজন। আর ইসলামী চরিত্র নামাযের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্বারাই গড়ে ওঠে। যখন এই পদ্ধতি লংঘিত হবে, তখন চরিত্রও নষ্ট হবে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো অবক্ষয় আর অধঃপতন (Degeneration)।

আত্মসংযম

চরিত্র গঠনের সাথে সাথে নামায মানুষের মধ্যে আত্ম সংযমের শক্তিও সৃষ্টি করে। এই আত্মসংযম ছাড়া চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। চরিত্র গঠনের মূল কাজ হলো মানবিক অহংবোধকে (Human Ego) প্রশিক্ষণ দিয়ে মার্জিত ও পরিশীলিত করে গড়ে তোলা মাত্র। কিন্তু এই প্রশিক্ষিত অহমিকা যদি তার যন্ত্র হিসেবে কার্যরত শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহকে কার্যকরভাবে পুরোপুরি বশে আনতে না পারে, তাহলে অহংবোধের প্রশিক্ষণ ও পরিমার্জিতকরণের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সঠিক আচরণ এবং নিখুঁত চাল-চলনের (Right Conduct) গুণ অর্জন করা যায়না। একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরা যায়। যেমন ধরে নেয়া যাক, একটি মোটর গাড়ী এবং একজন ড্রাইভারের সমষ্টির নাম মানুষ। এই সামষ্টিক বস্তুটি (মানুষ) তখনই সঠিক কাজ করতে সক্ষম হবে, যখন তার সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং তার সমগ্র শক্তি ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সাথে সাথে ড্রাইভারকে হতে হবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সংস্কৃতিবান ও রাস্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আপনি ড্রাইভারকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে দিলেন, কিন্তু স্টিয়ারিং, ব্রেক, এক্সেলারেটর যদি তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না থাকে, কিংবা যদিও বা থাকে তা খুবই নড়বড়ে হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ড্রাইভার গাড়ীকে চালাবেনা, বরং গাড়ীই ড্রাইভারকে চালাবে। গাড়ী যেহেতু শুধু চলতেই জানে। সে দেখেনা, বাছবিচার করতে জানেনা, রাস্তা চিনেনা। সুতরাং গাড়ী যদি ড্রাইভারকে নিয়ে চলে, তাহলে সে ড্রাইভারকে পথে বিপথে যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যাবে। এই উপমা অনুসারে মানুষের শারীরিক ক্ষমতা, জৈবিক কামনা ও মানসিক শক্তি গাড়ীসদৃশ এবং তার অহংবোধ (Ego) এই গাড়ীর চালক। এই গাড়ীটি লোহার তৈরি মটরের ন্যায়ই মূর্খ। তবে ঐ গাড়ীটি নির্জীব, আর এই গাড়ীটি সজীব। এই গাড়ীটির কামনা বাসনা, উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দাবি দাওয়া আছে আর সব সময় এ চেষ্টায় রতো থাকে যেনো ড্রাইভার তাকে চালাতে না পারে, বরং সে ড্রাইভারকে চালাতে পারে। সকল নবীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো ড্রাইভারকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে করে সে নিজের উপর চড়াও হতে না দেয়। বরং ড্রাইভার

গাড়ীতে আরোহণ করে স্বেচ্ছায় চালিয়ে সোজা রাজপথ ধরে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শুধু ড্রাইভারকে রাস্তার জ্ঞান, মটর গাড়ী ব্যবহার পদ্ধতি, ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং সার্বিকভাবে চালনার নিয়মাবলী শিখিয়ে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার বানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং স্টিয়ারিং, ব্রেক, এক্সেলারেটর সব সময় শক্ত হাতে ধারণ করাও আবশ্যক। কোনো অবস্থাতেই এগুলোর উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ ঢিলা বা দুর্বল হতে পারবেনা। কেননা এই দুরন্ত গাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ার জন্যে সব সময়ই শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে।

নামাযে দোয়া ও তাসবীহ সমূহের সাথে সময়ানুবর্তিতা, পবিত্রতা ইত্যাদির শর্তাবলী এবং শারীরিক তৎপরতা এ কারণে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে ড্রাইভার গাড়ীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং স্বেচ্ছাধীনভাবে মটর চালাতে দক্ষ হয়ে উঠে। এ পন্থায় মটরের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন পাঁচবার দমন করা হয়, ব্রেক কষা হয়। এক্সেলারেটর ও স্টিয়ারিং শক্ত করা হয় এবং ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়।

শীতের সকালে মজার ঘুম আসছে। আমার প্রিয় মন বলছে, 'আরো ঘুমিয়ে থাকো।' এ শুভ সকালে বিছানা ছেড়ে কোথায় যাবে? ওদিকে নামায উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে, সময় হয়ে গেছে, বিছানা ছাড়, গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করো, নতুবা অযু করো। শীতের মৌসুম? তা হোক। পানি গরম না থাকে তো ঠাণ্ডা পানি দিয়েই ওযু করো। তারপর চলো মসজিদে। এই দু'টো বিপরীতমুখী ডাকের মধ্যে আপনি যদি প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেন, তাহলে বুঝবেন মটরগাড়ী আপনার উপর চড়াও হয়েছে। আর যদি নামাযের ডাকে সাড়া দেন, তবে আপনিই মটরের উপর সওয়ার হলেন। এভাবে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা প্রত্যেক ওয়াক্তে নফস কোনো না কোনো ব্যস্ততা, লাভ-ক্ষতি, ভোগ-বিলাস, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে থাকে। সুযোগ খুঁজতে থাকে। আপনার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারলেই হয়, অমনি আপনার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসবে। তবে নামায সব সময় আপনার জন্যে বেত্রদণ্ড সদৃশ। সে আপনার ঝিমিয়ে পড়া ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে দেয় এবং আপনাকে শিক্ষা দেয়, যেনো আপনি মটর গাড়ীকে নিজের হুকুমের বশীভূত বানাতে পারেন। নিজে গাড়ীর বশীভূত হয়ে না যান। প্রত্যহ এরূপ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। কখনো নিজ ঘরে, কখনো প্রবাসে, কখনো গরমে, কখনো শীতে, কখনো বিশ্রামের সময়, কখনো কারবারের সময়, কখনো আমোদ প্রমোদের সময়, কখনো

দুঃখে দৈন্যে মুসিবতে। এরূপ অগণিত বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশে প্রবৃত্তির বাসনা আর নামাযের আহবানের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ হয়ে থাকে এবং আপনাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। নফসের কথা মানলেন তো পরাজয় বরণ করলেন, চাকর আপনার মনিব হলো। অন্ধ গাড়ীর হাতে আপনি নিজেকে সঁপে দিলেন। এবার গাড়ী আপনাকে পথে বিপথে নিয়ে যাবে। আর আপনি অসহায়ের মতো তাকে অনুসরণ করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি নামাজের আহবানে সফলভাবে সাড়া দেন, তাহলে এই গাড়ীর ঔদ্ধত্য চূর্ণ হবে। তার ওপর আপনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বীয় প্রজ্ঞা ও ইচ্ছানুযায়ী মটরের সমস্ত যন্ত্র ও শক্তি কাজে লাগানোর সামর্থ আপনার মধ্যে সৃষ্টি হবে।

এ কারণেই কুরআন বলেছে, নামায ত্যাগ করার তাৎক্ষণিক ও অনিবার্য পরিণতি এই যে, মানুষ রিপু ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় এবং সহজ সরল পথ ছেড়ে বাঁকা পথের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. (مريم : ٥٩)

অর্থ ঃ অতঃপর তাদের পর এমন অবাধ্য লোকের আগমন ঘটে, যারা নামাযকে পরিত্যাগ করে দেয় এবং প্রবৃত্তির শিকার হয়ে যায়। সুতরাং তারা অচিরেই পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে।' (সূরা মারিয়ম ঃ আয়াত ৫৯)

ব্যক্তি গঠনের কর্মসূচি

এ পর্যন্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে তা নামাযের উপকারিতা ও সার্থকতার একটি দিক মাত্র। নামাযের দ্বিতীয় দিকের আলোচনায় মনোনিবেশ করার আগে ব্যক্তি গঠনের এই কর্মসূচিটির উপর সামগ্রিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। এই কর্মসূচীর পাঁচটি অংশ।

১. মানুষের মন মগজে এ সত্যের অনুভূতি জাগ্রত রাখা যে, মানুষ এই দুনিয়াতে একজন স্বেচ্ছাচারী সত্তা নয়, বরং সারাজাহানের প্রতিপালকের বান্দাহ বা গোলাম। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকে যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হবে।

২. বান্দাহ হিসেবেই তাকে কর্তব্যবোধ সম্পন্ন রূপে গড়ে তোলা এবং কর্তব্য পালনের অভ্যাস সৃষ্টি করা।

৩. কর্তব্যবোধ ও কর্তব্য বোধহীনতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং কর্তব্য বোধহীন লোকদেরকে ছাটাই করে আলাদা করে দেয়া।

৪. একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্তাপদ্ধতি, একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানব মনে বদ্ধমূল করা এবং সেই আদর্শকে এতোটা সংহত করা, যাতে তা একটি সুদৃঢ় স্থায়ী চরিত্রে পরিণত হতে পারে।

৫. মানুষের মধ্যে এমন তেজোদ্দীপ্ততা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করা, যাতে মানুষ তার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি মুতাবিক যে কর্মপদ্ধতিকে সঠিক মনে করে, তদনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং নিজের শরীর ও আত্মার সমগ্র শক্তি এ পথে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। তার চরিত্র এতোটা শিথিল হবেনা যে, সঠিক মনে করবে একটি পদ্ধতিকে, অথচ রিপুর তাড়নায় বাধ্য হয়ে অনুসরণ করে চলবে ভিন্ন পন্থা।

ইসলাম যে সমাজ গঠন করে থাকে, তার প্রতিটি লোককে নামাযের সাহায্যে এভাবে তৈরি করে। এই সমাজের প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জন্যে দশ বছর বয়সেই নামায পড়া বাধ্যতামূলক (ফরজ) হয়ে যায়। আর এই ফরজ কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করা যায়না। যারা উম্মাদ, যে নারী মাসিক কিংবা প্রসব পরবর্তী নাপাক অবস্থায় থাকে, শুধুমাত্র তারাই এই ফরজ থেকে অব্যাহতি পাবে। অসুস্থ অবস্থায়, সফরে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ সময়েও এই ফরজ আদায় করতে হবে। দাঁড়ানো সম্ভব না হলে বসে, বসা সম্ভব না হলে শুয়ে আদায় করতে হবে। হাত পা নাড়াচাড়া করা সম্ভব না হলে ইশারায় আদায় করতে হবে। পানি না পেলে মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করতে হবে, কিবলার দিক অজানা থাকলে যেদিক কিবলা বলে অনুমান হয়, সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হবে। মোটকথা, এ ব্যাপারে কোনো ওজর আপত্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। নামাযের সময় হলে সর্বাবস্থায় এ ফরজ আদায় করা মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সারা বিশ্বে ইসলাম ছাড়া অপর কোনো সমাজ ব্যবস্থা এমন নেই, যার নিজের সাংগঠনিক উপাদানগুলোকে, অর্থাৎ নিজের লোকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এক এক করে তৈরি করার এমন পরিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। দুনিয়ার তাবৎ সামষ্টিক ব্যবস্থায় সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো গড়া এবং লোকদেরকে বাইরের বন্ধনে আবদ্ধ করাতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হয়। কিন্তু সমাজের (Community) এক একটি অংগকে ভিতর থেকে তৈরি করতে এবং সামাজিক মূলনীতি অনুসারে গড়ে তুলতে চেষ্টা কম করা হয়। অথচ জামায়াত বা সমাজের অবস্থা হলো একটি প্রাচীরের মতো, যা ইটের সমাহারে তৈরি হয়ে থাকে। প্রতিটি ইট যদি মজবুত না হয়, তাহলে প্রাচীর হবে সামগ্রিকভাবে দুর্বল। এভাবে ব্যক্তির চরিত্র যদি হয় দুর্বল, তাদের ধ্যান ধারণা যদি সাংগঠনিক

নীতি অনুযায়ী তৈরি না হয় এবং তারা কার্যত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার বিরোধী পথে চলতে আগ্রহী হয়, তাহলে শুধুমাত্র বাইরের বন্ধন সমাজের নিয়ম শৃংখলাকে বেশি দিনের জন্যে টিকিয়ে রাখতে পারবেনা। পরিশেষে দেখা দিবে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে গোটা সমাজ।

সমাজ জীবন

এবার আমাদেরকে নামাযের দ্বিতীয় বৈশিষ্টের প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার। একথা সত্য যে, ব্যক্তিচরিত্র এককভাবে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনা, যতোক্ষণ না এ চরিত্র দল বা সমাজের মধ্যেও বর্তমান থাকে। একজন লোক যেসব মানুষের মধ্যে জীবন যাপন করে, তাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া সে তার লক্ষ্যে ও আদর্শে (Ideal) আদৌ পৌঁছতে পারেনা। ব্যক্তি যে নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী হয়, তা একাকী অনুসরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব, যতোক্ষণ না সমগ্র সামাজিক জীবন সেইসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। দুনিয়াতে মানুষ একা সৃষ্টি হয়নি এবং একাকী সে কোনো কাজ করতেও সক্ষম নয়। তার গোটা জীবন ভাই-বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী ও জীবনের অগণিত সাথীদের সাথে হাজারো ধরণের সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সামাজিক জীবনে সামাজিক সম্পর্ক সমূহের মধ্যে আল্লাহর বিধান জারি করার জন্যেই মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী কাজ করা এবং এটা চালু করার নামই ইবাদত। যদি মানুষ এমনসব লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে, যারা এই বিধানকে আদৌ জানেনা অথবা তাদের সকলেই বিধান লংঘন করার প্রয়াসী, কিংবা তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক এ ধরণের যে, এই বিধান জারি করার জন্যে একে অপরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়, তাহলে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সে বিধান সামাজিক জীবনে চালু হওয়া তো দূরের কথা, একজন লোকের ব্যক্তিগত জীবনেও চালু হওয়া অসম্ভব।

তাছাড়া মুসলমানদের জন্যে এই পৃথিবী প্রাণান্তকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্বমুখর যুদ্ধক্ষেত্র বিশেষ। আল্লাহর সাথে বিদ্রোহীকারীদের বড় বড় জোট এখানে বিদ্যমান, যারা মানব জীবনে নিজেদের বানানো আইন কানুন সমস্ত শক্তি দিয়ে চালু করছে। তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের ওপর এক বিরাট কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দায়িত্বটা হলো, এখানে আল্লাহর বিধানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং যেখানে মানব রচিত আইন চালু আছে, সেগুলোকে উৎখাত করে তদস্থলে এক আল্লাহর আইনের শাসন কায়েম করা। এটা মুসলমানদের ওপর অর্পিত একটি মস্তবড় কাজ। এ

কাজ বিদ্রোহী জোটের মুকাবিলায় একাকী সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদাভাবে বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান শত চেষ্টা করেও প্রতিপক্ষের সংগঠিত শক্তির মুকাবিলায় সফলকাম হতে পারেনা। তজ্জন্য প্রয়োজন আল্লাহর ইবাদত করার প্রয়াসী সকল মানুষের এক জোট হওয়া, একে অপরের সাহায্যকারী হওয়া, একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্যে সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মুসলমানদের শুধু মিলেমিশে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এই মিলন হতে হবে সঠিক পদ্ধতির ভিত্তিতে। কেবলমাত্র সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এমন একটি সুষ্ঠু ও সৎ সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যার মধ্যে মুসলমানদের পারস্পারিক সম্পর্ক ইসলামের দাবি অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মধ্যে থাকবে সমতা, মমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, একাত্মতা ও কার্যকর একতা (Unity of action) সকলের মাঝে আল্লাহর বন্দেগি করার সম্মিলিত ইচ্ছা শুধুমাত্র থাকলেই চলবেনা, বরং এই সম্মিলিত ইচ্ছাকে হতে হবে সদা তৎপর। আর সংঘবদ্ধ তৎপরতার অভ্যাস তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হতে হবে, তাদের সকলকেই এটা জানা থাকা চাই যে, যখন তারা নেতা হবে। তখন নেতা হিসেবে তাদের কিভাবে আচরণ করা উচিত হবে, আর তারা অপর কারো অধীনস্থ হলে সে ক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য করতে হবে কিভাবে, কিভাবে পালন করবে তার নির্দেশ, কতোটুকু আনুগত্য করা তার জন্যে অপরিহার্য। কোন্ জায়গায় তারা তাকে শুধরে দেবে এবং কোন্ পর্যায়ে পৌছলে নেতা তাদের আনুগত্য পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

জামায়াতে নামায

নামায ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো বানায়। সেটাকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং প্রতিদিন পাঁচ বার চাংগা করতে থাকে, যাতে কাঠামোটি একটি মেশিনের মতো চালু থাকে। এ কারণেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। একেক জন লোক আলাদাভাবে নামায আদায় করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক ওজর ছাড়া মসজিদে না গিয়ে জামায়াতবিহীন নামায পড়ার জন্যে গুনাহগার হবে।

জামায়াতের ওপর এতো জোর দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের সংঘবদ্ধতার নিয়মনীতি সঠিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় রাখা। মসজিদে দৈনিক পাঁচ বারের সম্মেলন মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। এই ভিত্তির মজবুতির ওপর গোটা সমাজ কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভরশীল। এটা দূর্বল হলে সমগ্র সমাজকাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

আযান

নির্দেশ হলো, আযানের ধ্বনি শোনামাত্র উঠে দাঁড়াও, কাজ ছেড়ে মসজিদে যাও। এই আহবান শুনার পর মুসলমানদের চতুর্দিক থেকে একটি কেন্দ্রের দিকে ছুটে গিয়ে সমবেত হওয়া সেনাবাহিনীর সমাবেশের দৃশ্যেরই অবতারণা বৈকি। সেনাবাহিনীর লোক যেখানেই থাকুক, বিউগলের আওয়ায শুনতেই সে বুঝে নেয় তার নেতা তাকে ডাকছে। এই আহবানে সকলের মনে একটিমাত্র মনোভাব জাগে। তাহলো নেতার আদেশ মান্য করার সিদ্ধান্ত। এ অবস্থায় সকলে একটি কাজই করে, নিজ নিজ কাজ ছেড়ে দিয়ে সকল দিক থেকে একত্রিত হয়ে এক জায়গায় সমবেত হয়। সেনাবাহিনীতে এ পদ্ধতি কেন প্রবর্তিত হলো? এ জন্যে যে, প্রথমত এর দ্বারা প্রতিটি সৈনিক এককভাবে হুকুম মানতে এবং নিষ্ঠার সাথে তা বাস্তবায়ন করতে অভ্যস্ত হবে। সেই সাথে এ ধরনের সমস্ত অনুগত সেনা একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে একটি দল, একটি জোট, একটি টিম গড়ে উঠবে। নেতার নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে একই সময়ে একই জায়গায় সমবেত হওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হবে, যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের প্রয়োজন পড়লে গোটা সেনাবাহিনীর লোক একই আওয়াযে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে কাজ করতে পারে। সামরিক পরিভাষায় এটাকে দ্রুত সমাবেশ বা গতিশীলতা (Mobility) বলা হয়, আর এটা হলো সৈনিক জীবনের প্রাণ। যদি কোনো সেনাবাহিনী এভাবে ত্বরিত সমবেত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং বাহিনীর সেনারা এমন স্বেচ্ছাচারী হয় যে, যার যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকে চলে যায়, তাহলে এরূপ সেনাবাহিনীর একেকজন সৈনিক যথেষ্ট সাহসী ও নির্ভীক হলেও তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে পারবেনা। এ ধরণের সহস্র বীরসেনাকে শত্রুপক্ষীয় পঞ্চাশ জন সৈন্যের সুসংগঠিত দল এক এক করে ধরে ধরে খতম করে দিতে পারে। ঠিক এই মহৎ উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের জন্যেও এ নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে যে, যে মুসলমান যেখানেই এই আওয়ায শুনবে, সে তার সমস্ত কাজ কর্ম ত্যাগ করে নিকটবর্তী মসজিদে উপস্থিত হবে। প্রতিদিন পাঁচ বার তাদেরকে এই সমাবেশের অনুশীলনী করানো হয়।

কেননা এই খোদায়ী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দুনিয়ার সমগ্র সেনাবাহিনীর দায়িত্বের চেয়ে অধিক কঠিন, যেমনটা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য সেনাবাহিনীর বেলায় তো দীর্ঘ কালের ব্যবধানে কখনো একটি অভিযানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, আর সে জন্যে সমগ্র সেনাবাহিনীকে এতোসব সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র এই সেনাবাহিনীকে প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়, তাই রাতদিনে শুধুমাত্র পাঁচ বার আল্লাহ্‌র বিউগল বাজার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সেনানিবাসে অর্থাৎ মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার এই বিধানকে একটি মস্তবড় অনুগ্রহই বলতে হয়।

মসজিদে সমাবেশ

এতো গেলো শুধুমাত্র আযানের উপকারিতা। এবার আপনি মসজিদে একত্রিত হচ্ছেন। কেবল একত্রিত হওয়ার মধ্যেই যে কতো উপকারিতা রয়েছে, তা বলে শেষ করা যায়না। এখানে আপনি যে অপর একজনকে দেখলেন, চিনলেন, তার সম্পর্কে জানলেন, এই দেখা ও চেনাজানা কোন হিসেবে? এই হিসেবে যে, আপনারা সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ, এক রসূলের অনুসারী এবং এক কিতাবের অনুকরণকারী। সকলের জীবনের উদ্দেশ্য একটিই, আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই মসজিদে একত্রিত হওয়া। মসজিদ থেকে বের হয়েও এ উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। এ ধরণের পরিচিতি আপনাদের মাঝে স্বতই এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, আপনারা সকলেই একটি জাতি, একই সেনাবাহিনীর সৈনিক, একে অপরের ভাই বন্ধু। দুনিয়াতে আপনাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, লাভ-লোকসান সবকিছু একীভূত, একত্রিত। আপনাদের গোটা জীবনটাই পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উঠতে হলে একসাথে উঠবেন, আবার পতিত হলেও হবেন একত্রে।

আপনাদের এই দেখা হবে মুক্ত চোখের অকৃত্রিম দিব্যদর্শন। এ সাক্ষাত দুশমনের সাথে সাক্ষাত নয়, বরং এ দেখায় রয়েছে ভাই বন্ধুসুলভ দেখার অভিব্যক্তি। এই আবেগে আপ্লুত হয়ে যখন আপনি দেখবেন আপনার কোনো ভাই ছিন্ন বসনে আবৃত, কারো মুখমণ্ডলে রয়েছে অস্থিরতার ছাপ, কারো চেহারায় ফুটে উঠেছে অনাহারের চিহ্ন, কেউ রোগক্লিষ্ট, খোঁড়া, আঁতুর, কেউবা অন্ধ, তখন আপনার হৃদয়রাজ্যে স্বতই সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি হবে। আপনাদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল তারা গরীব অসহায় মানুষের ওপর দয়ার্দ্র হবেন। যারা দুর্দশাগ্রস্ত তারা ধনী লোকদের নিকট পৌঁছে নিজেদের

অবস্থা বর্ণনা করার সাহস পাবে। রোগ কিংবা কোনো মুসিবতে আটকে যাওয়ার কারণে কেউ মসজিদে আসতে না পারার কথা জানতেই আপনি তার সেবা শুশ্রুষায় চলে যাবেন। কারো মৃত্যু খবর শুনলে আপনি তার নামাযে জানাযায় শরীক হবেন এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনকে সান্তনা দেবেন। এসব কাজ সম্প্রীতি বৃদ্ধির উৎস। একজনকে আরেক জনের নিকটবর্তী এবং সাহায্যকারী বানাতে এগুলো সহায়ক।

আরো একটু চিন্তা করে দেখুন, এখানে আপনি একটি স্থানে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছেন। কোনো চিত্রতারকার আসক্তি আপনাকে এখানে টেনে নিয়ে আসেনি। মদ্যপান কিংবা খেলার জন্যে এখানে একত্রিত হননি। এটা দুরাচার লোকদের সমাবেশ নয় যে, সকলের মনেই ঘৃণ্য আশা আকাংখা ও উদ্দেশ্য থাকবে। এটা তো আল্লাহর বান্দাহদের সমাবেশ। আল্লাহর বান্দাহগণ আল্লাহর ঘরে আল্লাহর সামনে বন্দেগী করার সংকল্প ঘোষণা করার জন্যে হাযির হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে প্রথমত ঈমানদারের মনমানসে স্বীয় গুনাহের জন্যে লজ্জিত হওয়ার অনুভূতি আপনা থেকেই জাগ্রত হয়। কিন্তু যদি সে তার অপর কোনো ভাইয়ের সামনে গুনাহ করে থাকে আর সেই লোকটিও মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে কেবলমাত্র তার মুখোমুখী হয়ে যাওয়াই গুনাহগারের অন্তকরণে অনুশোচনা জাগ্রত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। যদি মুসলমানদের মধ্যে একে অপরকে নসিহত করার উদ্যম ও আকাংখা বিদ্যমান থাকে এবং সহানুভূতি ও সম্প্রীতির সাথে একে অপরকে কিভাবে সংশোধন করা উচিত তাও তাদের জানা থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন যে, এই সমাবেশ পরম রহমত ও বরকতের উৎস হয়ে দেখা দেবে। এভাবে সমগ্র মুসলমান মিলিত হয়ে একে অপরের ত্রুটি অপনোদন করবে। একে অপরের দোষ সংশোধন করবে এবং পরিশেষে গোটা জামায়াত সৎ লোকদের সংগঠনে পরিণত হবে।

সারিবদ্ধ হওয়া

এটা শুধুমাত্র মসজিদে একত্রিত হওয়ার সুফল। এবার ভেবে দেখুন, জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার মধ্যে কতোইনা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মসজিদে সকল মুসলমানের মর্যাদা সমান। একজন মুচি আগে এসেছে তো আগের সারিতে থাকবে। নেতাজি শেষে এসেছেন, তাই তার স্থান পিছনের কাতারে। যতো বড় লোক হোক না কেন, মসজিদে আসন সংরক্ষণের কোনো অধিকার তার নেই। কাউকে মসজিদের যে কোনো স্থানে দাঁড়াতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো থাকেনা। যে ব্যক্তি প্রথমে যে স্থানে অবস্থান

করছে, সেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে পারেনা। মানুষের ওপরে লক্ষ দিয়ে কিংবা কাতার ফাঁক করে আগের কাতারে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করার অধিকার কারো নেই। প্রত্যেক মুসলমান এক কাতারে একে অপরের পাশাপাশি দাঁড়াবে। সেখানে ছোট বড়, উঁচুনিচুর কোনোই ভেদাভেদ নেই। কারো স্পর্শে সেখানে কেউ অচ্ছুৎ হয়ে যায়না, কারো পাশে দাঁড়ালে তাতে কারো মানেরও হানি ঘটেনা। বাজারের ঝাড়ুদার গভর্ণরের পাশে দাঁড়িয়ে যাবে। এটা এমন সামাজিক গণতন্ত্র (Social Democracy) যা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা সফলকাম হতে পারেনি। এখানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে লোকদের উঁচুনিচুর প্রভেদ দুর করা হয়। আত্মম্ভরিতায় স্ফীত লোকদের মন থেকে অহংকার ও দম্ভ বের করে দেয়া হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মন থেকে হীনমন্যতার অনুভূতি দূর করা হয় এবং সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমরা সকল মানুষ সমান। নামাযের এই কাতারবন্দী যেমন শ্রেণী বৈষম্য মুছে ফেলে, তেমনি নিশ্চিহ্ন করে দেয় গোত্র, দেশ, বর্ণ ইত্যাদির গোঁড়ামীও। মসজিদে কোনো আভিজাত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মানুষের আলাদা কোনো দলবদ্ধতা নেই। মসজিদে আগত প্রতিটি মুসলমান কৃষ্ণাংগ কিংবা শ্বেতাংগ, ইউরোপীয় কিংবা এশীয়, আরব কিংবা অনারব, যাই হোক না কেন, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার শত বৈষম্যের ভেদাভেদ পায়ে দলে উঁচুনিচু ও ছোট বড় নির্বিশেষে সকলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। প্রতিদিন পাঁচবার এ ধরণের সমাবেশ বাইরের মত পার্থক্যের দরুন মানবীয় সমাজে সৃষ্ট সমস্ত গোঁড়ামী ও একগুয়েমী সমূলে ধ্বংস করে দিতে থাকে। একটা মানবীয় ঐক্য কায়েম করে, আন্তর্জাতিক বন্ধন মজবুত করে এবং মস্তিষ্কে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, সকল বংশীয় আভিজাত্য মিথ্যা, সমস্ত মানুষ এক আল্লাহর বান্দাহ। যদি তারা সকলেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করার ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তাহলে তারা সকলেই একই উম্মত বা জাতির অন্তর্ভুক্ত।

তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে একসাথে রুকু সিজদা করে, তখন প্যারেডের সাহায্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সংঘবদ্ধ সামাজিক তৎপরতা চালানোর যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়, অবিকল সেই যোগ্যতা তাদের মধ্যেও লালিত হয়। এর উদ্দেশ্যই হলো, মুসলমানদের মধ্যে একাত্মতা ও কাজের ঐক্য সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর ইবাদতে একে অপরের সাথে মিলে এক দেহের মতো হয়ে যাক।

সামষ্টিক দু'আ

নামাযে আল্লাহর কাছে যেসব দু'আ করা হয়, সেগুলো কতারবন্দীদের সব উপকারিতাকে দ্বিগুণ করে দেয়। সমবেত সকলেই সমস্বরে মালিকের কাছে আকুতি জানায়।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

অর্থ ঃ আমাদের সকলকে সরল সঠিক পথ দেখাও।'

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থ ঃ আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করো এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও।'

নামাজে উচ্চারিত দু'আগুলো আপনি কোথাও এক বচনে ব্যবহৃত পাবেননা। যেখানেই প্রার্থনাসূচক বাক্য দেখবেন, সেখানে তা বহুবচনেই দেখতে পাবেন। সম্মিলিত ইবাদত এবং সংঘবদ্ধ তৎপরতা একত্রিত হয়ে প্রতিটি মুসলমানের মনমানসে এই সামষ্টিক দু'আসমূহ প্রতিনিয়ত এই চিত্র বদ্ধমূল করছে যে, সে একা নয়। সবকিছু এককভাবে শুধু নিজের জন্যে চাওয়া ও প্রার্থনা করা তার পক্ষে সমীচীন নয়। বরং তার জীবন জামায়াত বা সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। জামায়াতের কল্যাণেই তার কল্যাণ নিহিত। জামায়াতের অনুসৃত ন্যায়ের পথে চলার মধ্যেই তার মংগল নিহিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও নিরাপত্তা জামায়াতের উপর নাযিল হলেই সে নিজেও তা ভোগ করতে পারবে। এর ফলে মস্তিষ্ক থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব (Individualism) দূরীভূত হয়। সৃষ্টি হয় সামাজিক মানসিকতা (Social mindedness)। দলের লোকদের মধ্যে শুভাকাংখার চেতনা ও আন্তরিক মহব্বতের বন্ধন বিকাশ লাভ করে এবং প্রতিদিন পাঁচবার মুসলমানদের সংঘবদ্ধ চেতনা এ পদ্ধতিতে উৎসারিত করা হয়, যাতে মসজিদের বাইরে জীবনের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে তাদের আচরণ সঠিক থাকে।

ইমামত বা নেতৃত্ব

এই সম্মিলিত ইবাদতটি একজন নেতা (leader) ছাড়া সম্পন্ন হয়না। মানুষ দু'জন হলেও ফরজ নামায দলবদ্ধ হয়েই আদায় করতে হবে। একজন ইমাম (Leader) অপরজন মুকতাদী (Follower)। জামায়াতে দাঁড়িয়ে গেলে জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে নামায পড়া একেবারে

নিষিদ্ধ। বরং এরূপ নামায আসলে ঠিকই হয়না। হুকুম হলো, যে আসবে সে ইমামের পিছনে জামায়াতে শামিল হবে। ইমামতির পদ কোনো শ্রেণী কিংবা কোনো বংশ অথবা কোনো গোষ্ঠীর জন্যে নির্ধারিত নয়। এজন্যে কোনো ডিগ্রী বা সনদেরও প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মুসলমান ইমাম বা নেতা হওয়ার যোগ্য। তবে শরীয়তের সুপারিশ হলো, ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে কতিপয় বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। বৈশিষ্টগুলোর কথা পরে উল্লেখ করা হবে।

জামায়াতে ইমাম ও মুকতাদীর সম্পর্ক যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এতে প্রতিটি মুসলমানকে নেতৃত্ব দান (leadership) ও নেতার আনুগত্যের পরিপূর্ণ ট্রেনিং দেয়া হয়। এতে শিখিয়ে দেয়া হয়, এই ক্ষুদ্র মসজিদের বাইরে পৃথিবী নামক বিশাল মসজিদে মুসলমানদের সামাজিক কাঠামোটা কিরূপ হওয়া উচিত। সমাজে নেতার মর্যাদা কি, তার দায়িত্ব কি, তার অধিকার কি এবং নেতা নিযুক্ত হলে তার কর্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে নেতার আনুগত্য কিভাবে করা উচিত এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে করা প্রয়োজন। যদি সে ভুল করে তাহলে মুসলমানগণ কি করবেন, ভুল হলে তা কতোটুকু অনুসরণ করবেন, কোথায় তাঁকে বাঁধা দেয়ার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কাছে এ দাবি তোলার অধিকার কোথায় থাকবে যে, নিজের ভুল শুধরে নিন এবং কোন্ পর্যায়ে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে। এগুলোর সবই যেনো স্বল্পপরিসরে একটি বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালনার অনুশীলনী। এই অনুশীলনী প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিটি ছোট ছোট মসজিদে পর্যন্ত করানো হয়।

শরিয়তের নির্দেশ এই যে, এমন লোককে ইমাম নিয়োগ করা চাই যিনি পরহেযগার, সচ্চরিত্রবান, ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক। এই গুণাবলীর মধ্যে কোন্টির ওপর কোন্টি অগ্রগণ্য তাও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে কোন্ কোন্ জিনিষের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে, এ শিক্ষাও এখানে দেয়া হয়েছে।

যার প্রতি জামায়াতের অধিকাংশ লোকের সম্মতি নেই, তাকে ইমাম না বানানোর নির্দেশ রয়েছে। অল্প বিস্তর বিরোধিতা কার না হয়? কিন্তু অধিকাংশ লোক যার অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক তাকে ইমাম নিয়োগ করা অনুচিত। এখানেও জাতীয় নেতা নির্বাচনের একটি নিয়ম শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। একজন কুখ্যাত লোক, যাকে তার অসৎ চরিত্র ও দুষ্কর্মের কারণে জনগণ ঘৃণা করে, সে মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্য নয়।

যিনি ইমাম হবেন, নামায পড়ানোর সময় জামায়াতে শামিল দুর্বল লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখার জন্যে তাঁর প্রতি নির্দেশ রয়েছে। শুধুমাত্র যুবক, শক্ত-সামর্থ, সুস্থ ও অবকাশপ্রাপ্ত লোকদের প্রতি লক্ষ করে দীর্ঘ কিরাত, লম্বা রুকু ও সিজদা করা চাইনা। বরং খেয়াল রাখতে হবে যে, জামায়াতে বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল এবং এমন ব্যস্ত লোক জনও রয়েছে, যারা জরুরি কাজ ছেড়ে নামায পড়তে এসেছে এবং নামায শেষ হতেই তাদেরকে কাজে ফিরে যেতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এতোদূর দয়া ও মহানুভবতা দেখিয়েছেন যে, নামায পড়ানো অবস্থায় শিশুর কান্নার আওয়ায পেলে তিনি নামায সংক্ষেপ করে দিতেন, যাতে জামায়াতে শামিল শিশুর মা-বাবা ও শিশুর কষ্ট না হয়। এটা যেনো জাতীয় নেতার জন্যে শিক্ষা বিশেষ। নেতা হলে জামায়াতে তাঁর কর্মপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সে শিক্ষাই এখানে নিহিত।

নিয়ম আছে, ইমাম সাহেব নামায পড়ানোর সময় যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নামায পড়ানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে হটে গিয়ে সে স্থানে পিছন থেকে একজনকে দাঁড় (ইমামতির দায়িত্ব দিবেন) করিয়ে দেবেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও রয়েছে জাতীয় নেতার জন্যে একটি শিক্ষা। তারও কর্তব্য হলো, নিজেকে নেতৃত্ব দান করার অযোগ্য মনে করলে তৎক্ষণাৎ নিজে সরে যাওয়া এবং যোগ্য লোকের জন্যে সে স্থান খালি করে দেয়া। এতে লজ্জারও কোনো ব্যাপার নেই, স্বার্থপরতারও কোনো অবকাশ নেই।

হুকুম রয়েছে, ইমামের কাজকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। ইমামের আগে কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি ইমামের আগে রুকু সিজদাকারী নামাযী সম্পর্কে হাদিসে আছে, কিয়ামত দিবসে গাধার আকৃতিতে তারা উত্থিত হবে। নেতার আনুগত্য কিভাবে করা উচিত জাতির জন্যে সেই শিক্ষা রয়েছে এ নির্দেশে।

যদি ইমাম নামাযে ভুল করে বসেন, যেমন দাঁড়ানোর স্থলে বসে পড়লেন, বসার স্থলে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাহলে নিয়ম হলো 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা। 'সুবহানাল্লাহ' বাক্যের অর্থ 'আল্লাহ পাক পবিত্র'। ইমামের ভুলের ওপর 'সুবহানাল্লাহ' বলার তাৎপর্য হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভুলের উর্ধে। তোমরা মানুষ। তোমাদের ভুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ইমামকে ভুল শুধরে দেয়ার এটাই পদ্ধতি।

ইমামকে যখন এভাবে ভুল ধরে দেয়া হবে, তখন তার উচিত কোনো লজ্জা

ও সংকোচ ছাড়াই নিজের ভুল শুধরে নেয়া। শুধু শুধরে নিলেই চলবেনা, বরং নামায শেষ করার আগে আল্লাহ তাআলার সামনে স্বীয় ক্রটির স্বীকৃতিস্বরূপ দু'বার সিজদাও করতে হবে। অবশ্য ভুল ধরে দেয়ার পরও ইমামের যদি এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এখানে তাঁর বসাই উচিত কিংবা দাঁড়ানোই উচিত হয়েছে, তাহলে তিনি তার দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন। এ অবস্থায় জামায়াতের কাজ হলো ইমামের আনুগত্য করা, যদিও জামায়াত (মুকতাদিগণ) স্বয়ং ইমামের ভুল হয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। নামায শেষ করার পর মুকতাদিগণ ইল্‌ম এবং যুক্তির ভিত্তিতে ইমামের ভুল প্রমাণ করার অধিকার রাখে এবং পুনর্বার নামায পড়ানোর জন্যে তারা ইমামের কাছে দাবি করতে পারে।

ইমামের সাথে জামায়াতের এই কর্মপ্রক্রিয়া শুধুমাত্র মামুলী ধরণের ছোটখাটো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ভুলক্রটি নিয়ে। কিন্তু যদি ইমাম নবীর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির খেলাফ করে নামাযের আকৃতি ও পদ্ধতি বদলিয়ে ফেলেন কিংবা কুরআন বিকৃত করে পড়েন অথবা নামায পড়ানো অবস্থায় কুফরী, শেরেকী কিংবা সুস্পষ্ট গুনাহ করে বসেন, অথবা এমন কোনো কাজ করেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আল্লাহর আইনের বিরোধী হয়ে গেছেন অথবা তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে, তাহলে এ অবস্থায় জামায়াতের কর্তব্য হলো নামায ছেড়ে দিয়ে তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাঁকে হটিয়ে অন্য কাউকে তাঁর জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়া। প্রথম অবস্থায় ইমামের অনুসরণ না করা যতোবড় গুনাহ, দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁর অনুসরণ করা ততোধিক বড় গুনাহ।

বৃহত্তর পরিসরে জাতি ও তাঁর নেতার সম্পর্কও হুবহু এ ধরণেরই। নেতা যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সংবিধান (Constitution) অনুযায়ী কাজ করতে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াযিব। আনুগত্য না করলে গুনাহ হবে। বড়জোর তাঁর ভুল ধরে দেয়া যায়। তা সত্ত্বেও যদি তিনি খুঁটিনটি ব্যাপারে ভুল করেন, তবে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু ইসলামী বিধানের সীমা অতিক্রম করলে তিনি আর কিছুতেই মুসলমানদের আমীর বা নেতা থাকতে পারবেন না।

এ পর্যন্ত নামাযের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এতে যদিও এর সকল দিক অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তথাপি এতে একথা ভালো করে বুঝতে পারা যায় যে, ইসলামে নামাযকে কেন প্রধান রুকন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এবং গোটা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংরক্ষক ও নীতি নির্ধারক কেবল একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং সে বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিতে, লালন পালনে, কর্ম পরিচালনায় ও স্থায়িত্ব দানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আনুগত্যের সামনেও মাথা নতো করে দিতে হবে। নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ভ্রান্ত দাবি থেকে ধ্যান ধারণা ও কাজ কর্ম উভয়কে মুক্ত রাখতে হবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে গ্রহণ করতে হবে যা একজন বান্দাহর জন্যে তার সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে এ জিনিসটিই ইসলাম ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। কুফরি অবস্থা এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মানুষ আল্লাহর মুকাবিলায় নিজেকে স্বেচ্ছাচারী ও লাগামহীন মনে করে এবং এটা মনে করেই নিজের জন্যে জীবনের লাগামহীন কর্মপন্থা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ইলাম একমাত্র এরই নাম যে, মানুষ নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করবে এবং বন্দেগি ও দায়িত্বের এই অনুভূতিসহ দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে। সুতরাং কুফরি অবস্থা থেকে বের হয়ে ইসলামের অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বকে যথাযথভাবে ও নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইসলামে থাকার জন্যে মানুষের অন্তরে বন্দেগি করার চেতনা ও অনুভূতি প্রতিনিয়ত সতেজ এবং সবসময় জীবন্ত এবং সর্বক্ষণ কার্যকর থাকা দরকার। কেননা এই চেতনা অন্তর থেকে দূর হওয়ার সাথে সাথেই স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার আচরণ ফিরে আসে এবং কুফরের সেই অবস্থা সৃষ্টি হয়, যে অবস্থায় মানুষ এই ভেবে কাজ করে যে, আল্লাহ তার হুকুমদাতাও নয় এবং তার কাছে নিজের কাজের জবাবদিহি করারও প্রয়োজন নেই।

যেমন প্রথমে বলা হয়েছে, নামাযের প্রধানতম উদ্দেশ্য মানুষের অভ্যন্তরে ইসলামের অর্থাৎ আত্মসমর্পণের উল্লিখিত অবস্থাটিকেই অনবরত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করতে থাকা। আর রোযার উদ্দেশ্যও তাই। তবে পার্থক্য এতোটুকু, নামায সামান্য বিরতি দিয়ে কিছু সময়ের জন্যে এটাকে প্রতিদিন সজীব করে, আর মাহে রমযানের রোযা বছরান্তে একবার অবিরাম পূর্ণ ৭২০ ঘন্টা পর্যন্ত এই অবস্থাকে মানুষের ওপর বলবৎ রাখে। যাতে তা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে মন মগজে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং বছরের অবশিষ্ট এগার মাস পর্যন্ত এর প্রভাব বর্তমান থাকে। প্রথমত কোনো ব্যক্তি রোযার কঠোর নিয়ম কানুনগুলো নিজের ওপর প্রয়োগ করতে তৈরিই হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না সে আল্লাহকে নিজের সর্বোচ্চ হুকুমদাতা মনে করতে পারবে এবং তার মুকাবিলায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে বিসর্জন দিতে পারবে। তারপর দিনের বেলায় যখন সে অনবরত ১২/১৩ ঘন্টা পানাহার ও স্ত্রী

সহবাস থেকে বিরত থাকে; সেহরীর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রবৃত্তির দাবি পূরণ থেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত থাকে এবং ইফতারের সময় হওয়ার সংগে সংগে জৈবিক চাহিদার প্রতি এমন তীব্র বেগে ধাবিত হয় যে, মনে হয় তার হাত, মুখ ও খাদ্যনালীতে তার নিজের নয়, বরং অপর কারো কর্তৃত্ব বিরাজমান। তা সে বন্ধ করতে বললে বন্ধ হয়, আর খুলতে বললে খুলে। এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, এই পুরো সময়টা জুড়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং স্বীয় দাসত্বের অনুভূতি তার মধ্যে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। পুরো একটি মাসের দীর্ঘ সময়ে এই অনুভূতি তার সচেতন কিংবা অবচেতন মন থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিলীন হয়নি। কারণ যদি বিলীন হয়ে যেতো, তাহলে তার পক্ষে রোযার বিধান লংঘন থেকে বিরত থাকা অসম্ভব ছিলো।

হুকুমের আনুগত্য

বন্দেগি করার অনুভূতির সাথে সাথে যে জিনিসটি তার অনিবার্য ফল হিসেবে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয় তাহলো, মানুষ নিজেকে যার বান্দাহ মনে করে তাঁর, হুকুমেরও আনুগত্য করে।

এই উভয় জিনিসের মধ্যে এমন স্বাভাবিক ও যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যে, একটি থেকে অপরটি বিচ্ছিন্ন হতেই পারেনা তাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটারও আদৌ অবকাশ থাকেনা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য হলো নিরংকুশ প্রভুত্বের স্বীকৃতিরই ফল। আপনি কারো আনুগত্য আদৌ করতে পারবেননা, যতোক্ষণ না তাকে খোদা[১] হিসেবে স্বীকার করবেন এবং

---

১. এখানে পাঠকবর্গকে কতিপয় পরিভাষার সাথে ভালোভাবে অবহিত করানো সংগত মনে করছি। ফারসী ভাষায় 'খোদা' শব্দটি আরবী ভাষায় 'ইলাহ' ও 'রব' শব্দের সমার্থবোধক। ইংরেজি ভাষায় ছোট অক্ষরের God শব্দটি প্রায় একই অর্থবোধক। হিন্দীতে 'দেবতা' শব্দটিও সেই অর্থের কাছাকাছি। উপযুক্ত শব্দগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি এমনসব সত্তা সম্পর্কে প্রয়োগ করে থাকে, যাদের হাতে মানুষের ভালোমন্দের এখতিয়ার নিবদ্ধ। যাদের নির্দেশ এই বিশ্বপ্রকৃতির কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ গণ্ডিতে কার্যকর থাকে, যাদের বন্দেগি করার ওপরই মানবকল্যাণ নির্ভরশীল। অহীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত জাতিসমূহ সব সময় এ ধারণা করে আসছে এবং এখনো করছে যে, এমন সত্তা অনেক বরং অগণিত। এসব সত্তার মধ্যে কেবল অমানবিয় সত্তা, যেমন ফেরেশতা ও জ্বিন জাতিই শামিল নয়, বরং কতিপয় মানবীয় সত্তা যেমন রাজা, বাদশাহ, পীর-আওলিয়া প্রমুখ আলৌকিক গুণাবলী প্রদর্শনকারী লোকগণও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে প্রায় সব ভাষাতেই উল্লিখিত শব্দগুলো বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আরবিতে আলিহাহ আরবাব, ফারসীতে খোদায়েগান, খোদাওয়ান্দ, ইংরেজিতে Gods এবং হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায়

সত্যিকার অর্থে যখনি আপনি কাউকে আপনার হৃদয় খোদায়ীর আসনে বসাবেন, তখন তাঁর বন্দেগি ও আনুগত্য হতে কোনোক্রমেই বিরত থাকতে পারবেননা।

মানুষ এতোটা বোকা নয় যে, সে কারো প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও অধিকার স্বীকার না করা সত্ত্বেও তার হুকুম মানতে থাকবে। আবার মানুষ এতোটা দুসাহসীও নয় যে, সে যাকে সত্যিকার অর্থে হৃদয় মন দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে, যাকে কল্যাণ ও অকল্যাণকারী এবং পালন ও লালনকর্তা হিসেবে মানে, তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আসলে কারো খোদায়ীর স্বীকারোক্তি এবং বন্দেগি ও আনুগত্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এবং উভয়ের মধ্যে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা জ্ঞান ও যুক্তির দাবিতে সম্পূর্ণ সংগত।

প্রভুত্ব ও খোদায়ীর ক্ষেত্রে একত্ববাদের স্বীকৃতি আবশ্যিকভাবে ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রেও একত্ববাদের প্রকাশ ঘটাবে। আর প্রভুত্ব ও খোদায়ীর ক্ষেত্রে শিরক করার ফলে ইবাদত আনুগত্যেও অনিবার্যভাবে শিরক প্রবিষ্ট

বহু দেবীগণ, দেবতাগণ ইত্যাদি। কিন্তু সর্বোপরি এমন একটি সত্তারও ধারণা সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত, যে সত্তা গোটা বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং যার অবস্থান ও মর্যাদা সকলের উপরে। আরবি ভাষায় আল্লাহ, ফারসীতে খোদায়ে খোদায়গা, ইংরেজিতে বড় অক্ষরের GOD, হিন্দীতে পরমেশ্বর সে সত্তারই, নাম। এ নামের বচনরূপ প্রয়োগ কোনো ভাষাতেই নেই। ইসলাম যে জিনিসের প্রতি আহবান করে তা হলো, যেসব এখতিয়ার ও ক্ষমতার জন্যে আপনারা ইলাহ ও খোদাওয়ান্দ ইত্যাকার শব্দ বলে থাকেন সেগুলো এককভাবে শুধুমাত্র এই সত্তারই অধীন। সমগ্র বিশ্বে কেবল তাঁরই একচ্ছত্র শাসন ও হুকুম চলছে, আপনাদের মঙ্গল অমঙ্গল তাঁরই হাতে। যাদেরকে আপনারা এই সাম্রাজ্যে শক্তিধর মনে করে খোদা, খোদাওয়ান্দ ও দেবতারূপে মানছেন, তারা সকলেই আপনাদের মতো সেই সর্বোচ্চ সত্তার অনুগত বা বান্দাহ। প্রকৃত ক্ষমতায় তাদের বিন্দুমাত্র অংশ নেই। সুতরাং ইলাহ, রব, খোদাওয়ান্দ, গড, দেবতা অনেক নয় বরং শুধুমাত্র এক ও একক, যাকে আপনারা আল্লাহ এবং অপর সমার্থবোধক শব্দে স্মরণ করে থাকেন। এই শিক্ষার প্রেক্ষাপটে পরিভাষাসমূহে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তা হলো, অমুসলমানদের জন্যে তো আগের পরিভাষাই থেকে যাবে এবং ছোট ছোট খোদা ও বড় খোদার জন্যে তারা আলাদা শব্দাবলী ব্যবহার করবে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে ইলাহ ও রব শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ আল্লাহ নামের সমার্থবোধক হবে। 'গড' শুধু বড় অক্ষরেই অবশিষ্ট থাকবে, ছোট অক্ষরে (Small letter) লেখার প্রয়োগ থাকবেনা। গড ও দেবতা শব্দদ্বয় 'পরমেশ্বর' শব্দের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। খোদা ও খোদাওয়ান্দ শব্দদ্বয় শুধুমাত্র 'খোদাওয়ান্দে আলমের' জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং এসব শব্দের কোনোটিই বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হবেনা।

হবে। আপনি একজনকে প্রভু মনে করলে তারই আনুগত্য করবেন, দশজনের প্রভুত্ব স্বীকার করলে আনুগত্যও উক্ত দশজনের মধ্যেই বিভক্ত হবে। আপনি প্রভু স্বীকার করবেন দশজনের অথচ আনুগত্য করবেন একজনের, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

প্রভু বা মনিবকে চিনতে পারলে বন্দেগি বা আনুগত্য করতে হবে তাও অনিবার্যভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। আপনি যাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করবেন আনুগত্য আবশ্যিকভাবে তারই করবেন। প্রভু মানবেন একজনকে আনুগত্য করবেন অন্য কারো, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং বাস্তব আনুগত্যের মধ্যে তো পরস্পর বিরোধিতার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু মন ও আত্মার প্রকৃত অনুভূতি ও চেতনা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তৎপরতার মধ্যে তা আদৌ সম্ভব নয়। কোনো বিবেকবান মানুষ একথা চিন্তাও করতে পারেনা যে, আপনি নিজেকে প্রকৃতপক্ষে যার বান্দাহ মনে করেন, তার ইবাদত না করে যাকে আপনি প্রভু মনে করেননা, তার ইবাদত করতে পারেন। বিবেকের ফায়সালা এই যে, যে সত্তাই আপনার আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে, প্রকৃতপক্ষে আপনার মস্তিষ্কে সেই সত্তার প্রভুত্বের চিত্রই অংকিত থাকবে, যদিও মৌখিকভাবে আপনি অন্য কারো প্রভু হওয়ার কথা প্রকাশ করে থাকেন।

প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি এবং বন্দেগির চেতনার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে তার পরিণামে হুকুমের আনুগত্যের মধ্যেও হ্রাস ঘটবে এটা অনিবার্য। কারো প্রভু হওয়া এবং নিজে তার বান্দাহ্ হওয়ার অনুভূতি আপনার অন্তরে যতোবেশি প্রবল হবে, ততোখানি গুরুত্ব সহকারে আপনি তার আনুগত্য করবেন। অনুভূতি যতো দুর্বল হবে আনুগত্যও ততো কম হবে। এমনকি যদি অনুভূতি একেবারে না থাকে তাহলে আনুগত্যও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে।

উপরোক্ত অভিসংবাদিত ও অকাট্য কথাগুলো মনে বদ্ধমূল করে নিলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায় করা এবং আল্লাহ ছাড়া অপর সকলের প্রভুত্ব অস্বীকার করানোর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেনো আল্লাহ ব্যতিত আর কারো ইবাদত ও আনুগত্য না করে। যখন আল্লাহ বলেন ঃ اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ 'তখন এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আনুগত্য ও দাসত্ব একনিষ্ঠভাবে ও নিরংকুশভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে। অপর কোনো সত্তার স্বতন্ত্র ও পৃথক আনুগত্য তাঁর সাথে মিশ্রিত হতে পারেনা।' যখন তিনি বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُو اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. (البينة : ٥)

অর্থ ঃ আর তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা

আল্লাহর বন্দেগি করুক, একনিষ্ঠ ও একমুখি হয়ে তারই আনুগত্য করুক।' (সূরা বায়্যিনাহ ঃ আয়াত ৫)

তখন এর তাৎপর্য দাঁড়ায়, মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগি করার জন্যে আদিষ্ট এবং তাঁর বন্দেগি করার শর্ত হলো আল্লাহর সাথে আর কারো আনুগত্য মিশ্রিত না করা।

আল্লাহর নির্দেশ[১],

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ.

অর্থ ঃ ফিৎনা অবশিষ্ট থাকা এবং আনুগত্য আল্লাহর জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করতে থাকো।' (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৯)

এর সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো, মুসলমানের ইবাদত আল্লাহর জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত এবং এমন প্রতিটি শক্তির সাথে মুসলমানদেরকে সংগ্রামরত থাকতে হবে, যারা এই আনুগত্যে ভাগ বসাতে চায়। যারা দাবি করবে মুসলমানগণ আল্লাহর সাথে তাদেরও ইবাদত করুক অথবা আল্লাহর পরিবর্তে শুধুমাত্র তাদেরই আনুগত্য করুক।

মুসলমান তিলাওয়াত করে ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ. (الفتح : ٢٨)

অর্থ ঃ তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ, যাতে করে এই দীনকে সব দীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।' (সূরা আল ফাতাহ ঃ আয়াত ২৮)

এ বাণীর সুস্পষ্ট মর্ম হলো, আল্লাহর আনুগত্য অন্যসব আনুগত্যের উপর বিজয়ী হওয়া চাই। আনুগত্য ও বশ্যতার সমগ্র ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া তার সকল দিক ও বিভাগসহ আল্লাহর আনুগত্যের অধীন হওয়া চাই। আনুগত্য যারই হোকনা কেন, তা হতে হবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ। যে আনুগত্যের জন্যে তাঁর কাছ থেকে ছাড়পত্র কিংবা নির্দেশনামা মিলবেনা, তার বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। এটা রসূলের মাধ্যমে পাঠানো আল্লাহর

---

১. 'জেনে রেখো, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্ভেজাল আনুগত্য' (যুমার ঃ ৩)। 'দীন' শব্দের প্রকৃত অর্থ আনুগত্য। রূপক অর্থে শব্দটিকে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক জাতির অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ ধর্ম ও জাতি প্রকৃতপক্ষে একটি নিয়মনীতি মেনে চলার নাম। এই গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করার পর মানুষ একটি বিধান ও আইনের প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে।

দীনের হক ও হেদায়াতের দাবি। এ দাবির প্রেক্ষাপটে মা-বাপ, গোত্র-সমাজ, দেশ-জাতি, আমীর-ওমরা, আলেম-ফাজেল, জীবিকার্জনের প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি, স্বীয় প্রবৃত্তি ও তার কামনা বাসনা যাই হোকনা কেন, এগুলোর যে কারো আনুগত্য আল্লাহ তাআলার মৌলিক ও বুনিয়াদী আনুগত্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারেনা। আনুগত্য পাওয়ার প্রকৃত যোগ্য সত্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। যে এ সত্তার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে এবং যে তাঁর জন্যে নিজের জীবনকে একমুখী করে নিয়েছে, সে যে কারো আনুগত্যই করুক না কেন, তাকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন থেকেই তা করতে হবে। যার কথা যতোটুকু সীমা পর্যন্ত মানার জন্যে সেখান থেকে অনুমতি মিলবে ততোটুকুই মানতে হবে। আর যেখানে অনুমতির সীমা শেষ হবে, সেখানে সে সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর অনুগত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। মানুষকে এই আনুগত্যের শিক্ষা দেয়াই রোযার উদ্দেশ্য। রোযা সারা মাসব্যাপী প্রত্যহ কয়েক ঘন্টা মানুষকে এমন অবস্থায় রাখে যে, নিজের একান্ত মৌলিক (Elementary) প্রয়োজন পূরণের জন্যেও তাকে আল্লাহর অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। সেখান থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত এক ফোটা পানি কিংবা এক লোকমা খাদ্যও খাদ্যনালী অতিক্রম করতে পারেনা। প্রতিটি জিনিস ব্যবহারের জন্যে সে আল্লাহর বিধানের প্রতি দৃষ্টি দেয়। যা সেখানে হালাল, তাকে হারাম করার জন্যে সারা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হলেও সেটা তার জন্যে হালাল থাকবে। আর যাকিছু তার কাছে হারাম, সেগুলো বিশ্ব জুড়ে সকলে মিলে হালাল করলেও তা হারামই থাকবে। এ অবস্থায় এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো অনুমতি তার জন্যে অনুমতি নয়, আর কারো নির্দেশ তার জন্যে নির্দেশ নয়। আর কারো নিষেধ তার জন্যে নিষেধাজ্ঞা নয়। নিজের ইচ্ছা থেকে নিয়ে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত এমন কোনো শক্তি নেই, যার নির্দেশে মুসলমান রমযানের রোযা ত্যাগ করতে কিংবা ভাংতে পারে। এক্ষেত্রে ছেলে বাপের, স্ত্রী স্বামীর, চাকর মনিবের, প্রজা রাজার, নেতা কর্মী বা ইমামের আনুগত্য করতে পারেনা। মোটকথা আল্লাহর মহান ও মৌলিক আনুগত্যের কাছে অন্যসব আনুগত্য গৌণ হয়ে যায়। ৭২০ ঘন্টার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনী দ্বারা রোযাদারের অন্তরে একই মনিবের বান্দাহ হওয়া, একই বিধানের অনুসারী হওয়া এবং একই আনুগত্যের শিকল পরার অনুভূতি পাথরে খোদাইয়ের মতো হৃদয়ে খোদিত হয়ে যায়।

এভাবে রোযা মানুষের সব রকমের আনুগত্যেকে সবদিক থেকে গুটিয়ে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ত্রিশ দিন পর্যন্ত ১২/১৪

ঘন্টা ধরে সেই একই কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। যাতে রোযাদার তার বন্দেগি ও আনুগত্যের কেন্দ্রকে চিনতে ও চিহ্নিত করতে পারে। রমযানের পর নিয়মানুবর্তিতার এই বন্ধন যখন খুলে দেয়া হবে, তখন যেনো তার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বিক্ষিপ্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে হারিয়ে না যায়। আনুগত্যের এ প্রশিক্ষণের জন্যে বাহ্যত মানুষের দু'টিমাত্র চাহিদাকে বেছে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাদ্য চাহিদা ও যৌন চাহিদা এবং এ দু'টিকেই শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে বাঁধা হয়েছে। তবে রোযার প্রকৃত শিক্ষা হলো, এ অবস্থায় মানুষের ওপর খোদার খোদায়ী ও তাঁর দাসত্বের চেতনা যেনো পুরো মাত্রায় কর্তৃত্বশীল থাকে এবং সে যেনো এমন অনুগত হয়ে সময় অতিবাহিত করে যে, যেসব বস্তু থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে বিরত থাকতে বলেছেন, সেসব বস্তু থেকেই সে বিরত থাকে। আর যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো প্রবল আগ্রহ সহকারে অবিলম্বে সম্পন্ন করে। রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই গুণ সৃষ্টি করা ও তার বিকাশ ঘটানো। নিছক পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রাখা নয়। এই গুণ যতোবেশি সৃষ্টি হবে, রোযা ততোবেশি পূর্ণতা লাভ করবে এবং এগুলোর যতোটা অভাব হবে রোযাও ততোটা অপূর্ণ থেকে যাবে। কেউ যদি এভাবে রোযা রাখে যে, যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় কেবলমাত্র সেসব জিনিস বর্জন করলো এবং আল্লাহর ঘোষিত অন্যসব হারাম কাজে রতো থাকলো। তাহলে তার এ রোযা হবে একটি মরা লাশের অনুরূপ। যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানব আকৃতি গঠিত হয়, তার সবই মরদেহে থাকে, শুধু থাকেনা প্রাণ। আর প্রাণ থাকার কারণেই মানুষকে মানুষ বলা হয়। প্রাণহীন এই লাশকে কেউ যেমন মানুষ বলবেনা, তেমনি প্রাণ সত্তাহীন এই রোযাকেও কেউ রোযা বলতে পারেনা। নিম্নোক্ত হাদিসটিতে নবী আলাইহিস্ সালাম এ কথাটিই বলেছেন ঃ

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه.

অর্থ ঃ যে মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারলোনা, তার পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন আল্লাহর নেই।'

'মিথ্যা বলার সাথে মিথ্যা কাজের' যেকথা বলা হয়েছে তা খুবই অর্থবহ। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সব নাফরমানির সমষ্টি। যে আল্লাহকে প্রভু স্বীকার করার পর তাঁর নাফরমানী করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের স্বীকৃতিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কাজের মাধ্যমে স্বীকৃতির বাস্তবায়ন করাইতো রোযার মূল লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু রোযাদার রোযা রাখার সময়ে যখন তা অস্বীকার করতে থাকে, তখন উপবাস ছাড়া রোযার মধ্যে আর কিইবা অবশিষ্ট রইলো?

অথচ বান্দার পেট খালি রাখার কোনোই প্রয়োজন আল্লাহর ছিলোনা। এ কথাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

كم من صائم ليس له من صيامه الا الظماوكم من قائم ليس له من قيامه الا سهر . (سنن الدار)

অর্থ ঃ কিছু সংখ্যক রোযাদারের রোযায় ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবেনা, আবার কিছু সংখ্যক রাতজাগা লোকের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়না।'

একথাটি আল্লাহ তাআলা কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

অর্থ ঃ তোমাদের উপর রোযা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ন্যায় ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারো।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৩)

অর্থাৎ, রোযা ফরজ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে তাক্ওয়ার গুণ সৃষ্টি করা। তাক্ওয়ার মৌলিক অর্থ ভয়ভীতি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা এর উদ্দেশ্য। আমার দৃষ্টিতে হযরত ওবাই বিন কা'আবের বর্ণিত ব্যাখ্যা 'তাকওয়া' শব্দের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ।

হযরত ওমর রা. তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাকওয়া' কাকে বলে?

জবাবে তিনি বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! এমন রাস্তা অতিক্রম করার সুযোগ কখনো আপনার হয়েছে কি, যা অত্যন্ত সরু এবং দু'দিক থেকে কাটাওয়ালা ঝোপঝাড়ে ঘেরা?'

হযরত ওমর (রা) বললেন, 'কয়েকবার হয়েছে!'

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ক্ষেত্রে আপনি কি করেন?'

হযরত ওমর (রা) বললেন, 'আমি আমার কাপড় জড়ো করে সংযত হয়ে চলি, যাতে জামায় কাটা জড়িয়ে না পড়ে।'

হযরত ওবাই (রা) বললেন, এরই নাম 'তাকওয়া'।

জীবনের এই চলার পথ, যে পথ বেয়ে মানুষ চলছে, উভয় পার্শ্ব থেকেই বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য, ষড়রিপুর আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির ঝোঁক, প্ররোচনা ও প্রলোভন, গোমরাহী ও নাফরমানীর কাটাযুক্ত ঝোপজংগলে আচ্ছন্ন। এই রাস্তার কাটা থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা এবং সত্যপথ থেকে লাইনচ্যুত হয়ে অসৎ কর্মের গুল্মলতায় নিজেকে জড়িয়ে না ফেলার নামই 'তাকওয়া'।

এ 'তাকওয়া' সৃষ্টি করার জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা রোজা ফরজ করেছেন। এটা একটি মহৌষধ। এতে সততা ও আল্লাহভীতিকে মজবুত ও শক্তিশালী করার উপাদান রয়েছে। তবে বাস্তবে এই শক্তি অর্জন মানুষের স্বীয় যোগ্যতা ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল। যদি সে রোযার উদ্দেশ্য বুঝে রোযার লুক্কায়িত শক্তি অর্জনের জন্যে তৈরি থাকে এবং রোযার সাহায্যে নিজের মধ্যে আল্লাহভীতি ও হুকুমের প্রতি আনুগত্যের গুণ বিকাশ করার চেষ্টা করে, তাহলে তার মধ্যে যথার্থ 'তাকওয়া' সৃষ্টি হতে পারে। এ 'তাকওয়া' কেবলমাত্র রমযান মাসেই নয় বরং পরবর্তী এগার মাস পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশের কাঁটাযুক্ত কোনো জংগলের সাথে জড়িয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে জীবনের সহজ সরল রাজপথে তাকে চালাতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে তার জন্যে রোযার সওয়াব এবং প্রতিদানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু যদি সে মূল লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে রোযা (উপবাস) ভংগ না করাকেই রোযা মনে করে এবং তাকওয়ার গুণ অর্জন করার প্রতি মনোযোগি না হয়, তাহলে স্বীয় আমলনামায় রোযার নামে উপবাস এবং রাতজাগা ছাড়া অন্য কিছু সে পেতে পারেনা, এটা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى دانا اجزى به. (متفق عليه)

অর্থ ঃ মানুষের প্রত্যেক আমল আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু বাড়ে। একটি নেকী দশ থেকে ৭শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। এর প্রতিদান আমার মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আমি যতো ইচ্ছা প্রতিদান দেবো।' (বুখারী মুসলিম)

অর্থাৎ রোজার ব্যাপারে প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনা অগণিত ও সীমাহীন। এ দ্বারা মানুষ তাকওয়া হাসিল করার চেষ্টা যতোবেশি করবে ততোই তা বৃদ্ধি পাবে। শূন্য থেকে আরম্ভ করে লাখো কোটি, বিলয়ন, মিলিয়নে পৌঁছতে পারে। মোটকথা, তার উন্নতির কোনো সীমা পরিসীমা থাকেনা। রোযার সাহায্যে তাকওয়া হাসিল করা কিংবা না করা, করলে কতোটুকু করবে, সেটা রোযাদারের যোগ্যতা ও সামর্থের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়নি, রোযা রাখলে তোমরা অবশ্যই মুত্তাকী হয়ে যাবে। বরং বলা হয়েছে, অর্থাৎ আশা করা যায় অথবা সম্ভাবনা আছে যে,

এর সাহায্যে তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পারবে।[১]

চরিত্র গঠন

প্রকৃতপক্ষে এ তাকওয়াই ইসলামী চরিত্রের জীবনীশক্তি। ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে যে ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করতে চায় তার ইসলামী রূপ এই তাকওয়া শব্দের মধ্যে নিহিত। পরিতাপের বিষয় যে, শব্দটির তাৎপর্য বর্তমানে সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। লোকেরা মনে করে, একটি বিশেষ পদ্ধতির আকার আকৃতি ও বেশভুষা বানিয়ে নেয়া, কতিপয় প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা এবং সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কতিপয় খারাপ কাজ পরিহার করে চলার নামই তাকওয়া। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিভাষা। মানব জীবনের সকল দিক এ পরিভাষাটির আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআন মানুষের চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি নীতিগতভাবে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে থাকে।

প্রথমত যাতে মানুষ ঃ

১. দুনিয়ার শক্তিসমূহ ছাড়া অন্য কোনো উর্ধ্বতন শক্তিকে নিজের তত্ত্বাবধায়ক মনে করেনা এবং মানুষের উর্ধ্বে অপর কোনো বিচারকের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা মনে করে সে জীবন যাপন করে।

২. ইহলৌকিক জীবনকেই জীবন, পার্থিব লাভকেই লাভ এবং ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ কর্মপন্থা গ্রহণ করা কিংবা না করার ব্যাপারে শুধু পার্থিব লাভ লোকসানের ওপর নির্ভর করেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

৩. জাগতিক লাভের মুকাবিলায় নৈতিক ও আত্মিক মহত্ব ও মর্যাদাকে অবাস্তব মনে করে এবং পার্থিব ক্ষতির মুকাবিলায় চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করে।

---

১. লোকেরা সাধারণত এর অনুবাদ 'যাতে' করে থাকে। কিন্তু অভিধানের দৃষ্টিতে এ অনুবাদ ঠিক নয়। لَعَلَّكُمْ শব্দটি আরবি ভাষায় আশা, আকাংখা, সম্ভাবনা, সন্দেহ ইত্যাকার অনিশ্চিত সম্ভাবনার অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে 'যাতে' শব্দটি শধুমাত্র রোযা ফরজ হওয়ার কারণ দর্শানো বুঝায়। শুধু কারণ বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ এর স্থলে لِتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُتَّقِيْنَ। বলতেন। এ ক্ষেত্রে সন্দেহবোধক শব্দের প্রয়োগে লোকেরা সম্ভবত এর নিগূঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। এ কারণে তারা لَعَلَّ শব্দের অনুবাদ 'যাতে' করেন। ফলে সঠিক অনুবাদ দ্বারা যে বক্তব্য খোলাসা হচ্ছেনা বলে মনে হয়, তা ভুল অনুবাদ দিয়ে খোলাসা করার চেষ্টা করা হয়।

৪. কোনো স্বতন্ত্র নৈতিক বিধানের অনুসরণ করেনা, বরং স্থান কাল পাত্র ভেদে নিজেই নৈতিক নীতি বানিয়ে নেয়, আবার প্রয়োজনবোধে তা বদলিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত যাতে মানুষ ঃ

১. নিজেকে এমন এক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসকের অধীন এবং তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে, যিনি দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। সে এটা মনে করেই জীবন যাপন করে যে, তাকে একদিন ইহলৌকিক জীবনের সবকিছুর হিসেব দিতে হবে।

২. সে পার্থিব জীবনকে প্রকৃত মানবজীবনের প্রথম সোপান মনে করে। এখানকার লাভ লোকসানকে সে ক্ষণস্থায়ী ও প্রতারণামূলক পরিণতি মনে করে। আখিরাতের চিরন্তন জীবনের লাভ লোকসানের উপর ভিত্তি করেই সে তার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

৩. বস্তুগত ও ইহলৌকিক লাভের মুকাবিলায় নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলীকে অধিক মূল্য দিয়ে থাকে এবং পার্থিব লোকসানকে নৈতিক ও চারিত্রিক লোকসানের মুকাবিলায় অতি তুচ্ছ মনে করে।

৪. সে এমন একটি অলংঘনীয় নৈতিক আদর্শের অনুসরণ করে, যা নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো সংশোধন ও রহিত করার স্বাধীনতা তার নেই।

কুরআন প্রথম প্রকারের চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতির সার্বিক নাম দিয়েছে ফুজুর[১] আর দ্বিতীয় ধারণা ও কর্মপদ্ধতিকে তাকওয়া[২] নামে অভিহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা জীবনের দুটি বিপরীতমুখী পথ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও এ দুয়ের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। ফুজুর তথা সুবিধাবাদের পথ গ্রহণ করে মানুষ তার গোটা জীবনকে তার সমস্ত দিক ও বিভাগসহ একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে থাকে। এতে তাকওয়ার বাহ্যিক রূপ কোথাও কোথাও ফুটে উঠতে পারে, কিন্তু তাকওয়ার প্রাণশক্তির নাম গন্ধও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কারণ সুবিধাবাদ ও ভোগবাদের সমস্ত তাত্ত্বিক অংশ পরস্পরের সাথে যৌক্তিক বন্ধনে আবদ্ধ।

---

১. আজকালের পরিভাষায় আমরা এটাকে বস্তুবাদ। (Materialism), উপযোগবাদ (Utilitarianism), প্রয়োগবাদ (Progmatism) এবং সুবিধাবাদ (Opportunism) নামে অভিহিত করতে পারি।

২. পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক এ ধরণের ধ্যান ধারণার সাথে খুবই অপরিচিত হওয়ার কারণে আধুনিক যুগের পরিভাষায় তাক্ওয়ার সঠিক তাৎপর্য বহন করে এমন শব্দ পাওয়া দুষ্কর। ইংরেজী শব্দ Piety-কে (ঈশ্বরভক্তি) আর্চ বিশপগণ তাক্ওয়ার সমার্থক থাকতে দেয়নি। অধিকন্তু এতে তাক্ওয়ার ব্যাপকতাও অনুপস্থিত।

তাকওয়ার তাত্ত্বিক অংশগুলোর একটি অংশও সুবিধাবাদের সেই সুবিন্যস্ত কাঠামোতে ঠাঁই পেতে পারেনা। অপরদিকে তাকওয়ার পথ গ্রহণ করলে মানুষের গোটা জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। তখন সে এক ভিন্নতর পদ্ধতিতে চিন্তা করে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপার ও সমস্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে গ্রহণ করে থাকে একটি পৃথক পদ্ধতি। এ দু'টি পথের পার্থক্য কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং সামষ্টিক জীবনের সাথেও সংশ্লিষ্ট। যে সমাজ সুবিধাবাদি ও সেচ্ছাচারী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হবে অথবা দুরাচার লোকেরা যে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ্যতা লাভ করবে এবং ফাসেক ফাজের লোকের হাতে যে সমাজের নেতৃত্ব থাকবে, সে সমাজের গোটা সভ্যতা সংস্কৃতি সুবিধাবাদ ও স্বেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ হবে। তার সমাজ, তার নৈতিকতা, তার অর্থনীতি, তার রাজনীতি, তার শিক্ষানীতি, তার কূটনীতি, মোটকথা তার প্রতিটি ব্যাপারে সুবিধাবাদী ভাবধারা সক্রিয় থাকবে। এরূপ সমাজে, বেশকিছু লোক কিংবা কতিপয় লোককে স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদের উর্ধে পাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তাদের পক্ষে বড়জোর এতোটুকু উর্ধে উঠা সম্ভব যে, তারা হয়তো আপন স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের মধ্যে বিলীন করে দেয়। কেননা তার উন্নতির সাথে তাদের নিজেদের উন্নতি এবং তার অবনতির সাথে তাদের নিজেদের অবনতি জড়িত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে যদি পাপ ও অন্যায়ের পরিমাণ কমও হয় তাতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হবেনা। তাদের জাতীয় নীতি ও আচরণধারা সর্বাবস্থায় স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে চলবে। এভাবে তাকওয়াও নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। যখন কোনো মানবগোষ্ঠী মুত্তাকী লোকদের দ্বারা গঠিত হয় কিংবা তাতে মুত্তাকী লোক সংখ্যায় বেশি হয় এবং তার নেতৃত্ব থাকে পরহেজগার লোকদের হাতে, সে সমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহভীতির ছাপ সবদিক থেকে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তারা সাময়িক স্বার্থ ও হুজুগ দ্বারা জড়িত হয়ে আপন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেনা। বরং একটি শাশ্বত বিধানের অনুসরণ করে থাকে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সমগ্র চেষ্টা সাধনাকে উৎসর্গ করে দেয়। জাগতিক দিক থেকে জাতির লাভ লোকসান কি হয় সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপই করেনা। এ দল বস্তুবাদী ফায়দার পিছনে হন্যে হয়ে ঘোরেনা বরং স্থায়ী নৈতিক ও আত্মিক স্বার্থ ও কল্যাণকে নিজের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সুযোগ ও সুবিধার নিরিখে তারা আদর্শকে ভাংগেওনা, গড়েওনা বরং সর্বাবস্থায় সত্যের আদর্শের অনুসারী থাকে। কেননা এর বিরুদ্ধবাদী জাতিগুলোর শক্তি কম না বেশি, তাতে এদের কিছু আসে

যায়না। তারা ভয় করে শুধু আল্লাহকে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি যে করতেই হবে, এই ভাবনাই তাদেরকে দিশেহারা করে দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের যাবতীয় বিকৃতি ও মানব জাতির বিপর্যয় ও ধ্বংসের মূল কারণ এই ফুজুর বা স্বেচ্ছাচারিতা। ইসলাম স্বেচ্ছাচার ও পাপাচারের এই কেউটে সাপটিকে হত্যা করতে চায় অথবা এর বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চায়। যাতে কেউটে বেঁচে থাকলেও মানবতাকে ছোবল মারার শক্তি তার অবশিষ্ট না থাকে। এ উদ্দেশ্যে সে মানবজাতি মধ্যথেকে এমন লোকদের বেছে বেছে বের করে নিজের দলে ভর্তি করতে চায় যারা স্বভাবগতভাবে পরহেযগারির প্রতি অনুরাগী। পাপাচারী মানসিকতাসম্পন্ন লোক ইসলামের কোনো কাজে আসেনা। চাই সে ঘটনাক্রমে মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করুক এবং মুসলিম জাতির দরদে যতোই ছটফট করুক। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্যে এমন লোকের প্রয়োজন, যাদের মধ্যে নিজেদের দায়িত্বের অনুভূতি রয়েছে। যারা নিজের হিসাব নিজেই নিতে পারে, যারা নিজের মনের ইচ্ছা ও আকাংখার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যাদেরকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্যে বাহির থেকে কোনো চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়না। বরং তাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে সংগোপনে এমন একজন শাসক ও হিসাব নিরীক্ষক বসে থাকেন, যিনি ভিতর থেকে তাদেরকে আইনের অনুসারী করেন এবং এমন আইন লংঘন থেকে বাধা দেন, যা কোনো পুলিশ কোনো আদালত এবং জনমতের অবহিত হওয়া অসম্ভব। ইসলাম এমন লোক চায় যাদের অটল বিশ্বাস থাকে যে, একটি চোখ সর্বাবস্থায় তাদেরকে দেখছে। যাদের ভয় আছে যে, এমন একটি আদালতে তাদেরকে অবশ্যই হাজিরা দিতে হবে যা ইহলৌকিক লাভ লোকসানের তোয়াক্কা করেনা, তাৎক্ষণিক স্বার্থের গোলাম নয় এবং ব্যক্তি কিংবা জাতীয় স্বার্থের তল্পিবাহী নয়। ইসলামের এমন লোক প্রয়োজন যাদের দৃষ্টি আখিরাতের প্রকৃত ও যথার্থ কর্মফলের উপর নিবদ্ধ। যাদেরকে দুনিয়ার বড় বড় ফায়দার লালসা কিংবা মস্তবড় ক্ষতির ভীতিও আল্লাহর দেয়া বিধান এবং তাঁর বর্ণিত নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনা। যাদের সমস্ত চেষ্টা সাধনা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে নিবেদিত। যাদের এই বিষয় দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, চুড়ান্ত পরিণতিতে হকের আনুগত্যের ফল অবশ্যই ভালো আর বাতিলের আনুগত্যের ফল অবশ্যই খারাপ হবে, যদিও এই দুনিয়ায় তার ফলাফল বিপরীত হয়ে থাকে। তাছাড়া ইসলাম এমন ধরণের লোক সন্ধান করে, যাদের মধ্যে একটি সঠিক ও মহান উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে বছরের পর বছর এমনকি আজীবন অবিরাম নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মতো

ধৈর্য ও সহনশীলতা বিরাজমান। যাদের মধ্যে এতোটা অনমনীয়তা ও দৃঢ়তা থাকবে যে, ভুল পথের সহজসাধ্যতা স্বাধ ও আনন্দ কোনো কিছুই তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনা। যাদের মধ্যে এতোটুকু সহিষ্ণুতা আছে যে, সত্যপথে চলতে গিয়ে যতো ব্যর্থতা, অসুবিধা, বিপদাপদ, বালা মুসিবত এবং বাধা বিপত্তিরই সম্মুখীন হোক না কেন, তাতে তাদের পা টলবেনা। যাদের মধ্যে এমন আন্তরিকতা ও একাগ্রতা থাকবে যে, সব ধরণের সাময়িক ও তাৎক্ষণিক স্বার্থ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। যাদের মধ্যে এতোটুকু তাওয়াক্কুল থাকবে যে, তার সত্যের সাধনা ও সত্যানুসন্ধানের অনিবার্য ও সুধুরপ্রসারী পরিণতির জন্যে বিশ্ববিধাতার ওপর ভরসা করতে পারে, যদিও পার্থিব জীবনে এ কাজের ফলাফল আদৌ নজরে না আসে। এমন প্রকৃতির লোকদের চরিত্রের ওপরই নির্ভর করা সম্ভব। ইসলাম তার নিজস্ব দল দ্বারা যে কাজ নিতে চায় সে কাজের জন্যে এমন নির্ভরযোগ্য কর্মীবাহিনীরই প্রয়োজন।

তাকওয়ার এই গুণগত প্রাথমিক উপাদান যাদের মধ্যে বর্তমান, তাদের মধ্যে তার বিকাশ সাধন ও সুদৃঢ়করণে রোযার চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কোনো উপায় হতে পারেনা। রোযার বিধানগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি দিলে আপনার নিজের কাছেই একথা মূর্ত হতে থাকবে যে, এ জিনিসটি কেমন পূর্ণাংগ পন্থায় এই গুণগুলোকে স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধি প্রদান করে। একটি লোককে বলা হলো, 'আল্লাহ তোমার ওপর রোযা ফরজ করেছেন। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খেয়োনা পান করোনা। কোনো বস্তু খাদ্যনালী অতিক্রম করলে তোমার রোযা ভেংগে যাবে। যদি তুমি লোকদের সামনে পানাহার থেকে বিরত থেকে গোপনে পানাহার করো, তাহলে তুমি লোকদের কাছে রোযাদার হিসেবে গণ্য হলেও আল্লাহর কাছে হবেনা। তোমার রোযা সে অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে যখন রোযা হবে নিরেট আল্লাহর জন্যে। অন্যথায় স্বাস্থ্যের উন্নতি কিংবা সুনাম কুড়ানোর মতো অপর কোনো উদ্দেশ্যে রোযা রাখা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিতান্তই মূল্যহীন। আল্লাহর জন্যে রোযা রাখলে তার প্রতিদান এ দুনিয়ায় মিলবেনা। আবার রোযা ভাংলে কিংবা না রাখলে তার কোনো শাস্তিও এ দুনিয়ায় পাবেনা। মরণের পর যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন পুরস্কারও মিলবে এবং সে সময় শাস্তিও দেয়া হবে।' এই কয়টি উপদেশ দিয়ে মানুষকে ছেড়ে দেয়া হয়। তাকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের জন্যে কোনো সৈনিক, কোনো প্রহরী, কোনো সিআইডির লোক নিয়োগ করা হয়না। বড়জোর জনমতের চাপে কারো সামনে কোনো কিছু খানাপিনা না করতে তাকে বাধ্য করা যায়। কিন্তু গোপনে চুপিসারে পানাহার থেকে তাকে বিরত

রাখার কেউ নেই। রোযাদার আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছে কিনা, সে হিসাব নেয়া তো জনমত কিংবা রাষ্ট্রের ক্ষমতার আওতাভুক্তই নয়। এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি রোয়ার যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণ করে থাকে, চিন্তা করে দেখুন তার অন্তরাত্মায় কি ধরণের গুণবৈশিষ্ট জন্ম লাভ করে।

১. সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ সদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি সর্বশক্তিমান। সে আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।

২. আখিরাতের হিসাব কিতাব শাস্তি ও প্রতিদানের ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাস অন্তত ১২/১৪ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত ও অটল ছিলো, যখন সে রোযার শর্তগুলোর ওপর অবিচল ছিলো।

৩. তার মধ্যে স্বতষ্ফূর্তভাবেই স্বীয় কর্তব্যের অনুভূতি বিদ্যমান। সে নিজের দায়িত্ব বুঝে। তার নিজের উদ্দেশ্যের সততার নিরীক্ষক সে নিজেই। নিজের মনের পর্যবেক্ষণ সে নিজেই করে থাকে। বাইরে বিধান লংঘন কিংবা পাপে লিপ্ত হওয়ার আগেই যখন স্বীয় প্রবৃত্তির গভীরতম প্রকোষ্ঠে পাপের বাসনা জাগে, তখনই সে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তা সমূলে বিনাশ করে দেয়। এর অর্থ হলো, আইন অনুসরণের জন্যে বাইরের কোনো চাপের মুখাপেক্ষী সে নয়।

৪. বস্তুবাদ এবং নৈতিকতা ও রূহানিয়াতের মধ্যে যে কোনো একটিকে নির্বাচন করার যখন তাকে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তখন সে আধ্যাত্মিকতাকেই নির্বাচিত করেছে। দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যখন কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রশ্ন তার সামনে দেখা দেয়, তখন সে আখিরাতকেই প্রাধান্য দেয়। তার মধ্যে এতোটা তেজস্বিতা ছিলো যে, সে নৈতিক লাভের খাতিরে পার্থিব ক্ষতি ও লোকসানকে মেনে নিয়েছে এবং আখিরাতের লাভের আশায় দুনিয়ার লোকসান সে বরণ করে নিয়েছে।

৫. নিজের সুবিধামতো ভালো মৌসুমে আরামদায়ক সময়ে এবং অবসর মুহূর্তে রোযা রাখার ব্যাপারে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করেনা। বরং যে সময় আইন কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে সেই সময়েই রোযা রাখতে সে বদ্ধপরিকর।

মৌসুম যতোই সংগীন হোক, অবস্থা যতোই প্রতিকূল হোক এবং নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক থেকে সে সময়ের রোযা যতোই ক্ষতিকর হোক, তাতে সে দমবার পাত্র নয়।

৬. সবর, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এবং

পার্থিব প্ররোচনা ও প্রলোভন মুকাবিলার শক্তি অন্তত এতোটুকু পরিমাণে তার মধ্যে বিদ্যমান যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মহান উদ্দেশ্যের খাতিরে সে এমন একটি কাজ করছে যার ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে মুলতবী রাখা হয়েছে। একাজ করার সময়ে সে স্বেচ্ছায় নিজের রিপুকে দমন করে থাকে। প্রখর গরমে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, শীতল সুপেয় পানি সামনে প্রস্তুত, ইচ্ছা করলে সহজেই গলধকরণ করা যায়, কিন্তু তা সে করেনা। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, খাদ্য ইচ্ছা করলেই খাওয়া যায়, কিন্তু সেখায়না। যুবক স্বামী ও যুবতী স্ত্রী। যৌন কামনা সুড়সুড়ি দিচ্ছে প্রবলবেগে, ইচ্ছা করলেই চাহিদা মিটাতে পারে সকলের অগোচরে, কিন্তু তাও তারা করেনা। সহজলভ্য ভোগের উপকরণ থেকে এভাবে দৃষ্টি ফিড়িয়ে নেয়া, এমন ক্ষতি এভাবে বরণ করে নেয়া এবং নিজের মনোনীত সত্য পথে সুদৃঢ় থাকাটা পার্থিব জীবনে অর্জন করার মতো কোনো লাভের আশায় নয় বরং এমন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে যার সম্পর্কে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের আগে তা পাওয়ার আশা রেখোনা।

প্রথম দিন রোযা রাখার ইচ্ছা করতেই মানব মনে এসব অবস্থা ও গুণাবলী জাগ্রত হতে শুরু করে। আর যখন সে সত্যি সত্যি রোযা রাখে তখন এটা একটি বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। ত্রিশ দিন পর্যন্ত একটানা এ কাজটা করার ফলে এই শক্তি দৃঢ় হতে থাকে। সাবালক হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনেই প্রতি বছর এভাবে ত্রিশ দিনের রোযা রাখার ফলে এ স্বভাব তার মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়। মহৎ গুণাবলী অর্জনের এই মহড়া এ জন্যে দেয়া হয়না যে, শুধু রোযা রাখার ব্যাপারে এবং কেবলমাত্র রমযান মাসেই তা কাজে আসবে।

এ মহড়ার উদ্দেশ্য এই যে, এই উপাদানগুলো দিয়ে যেন মানব চরিত্রের স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি হতে পারে। পাপাচার হতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে এবং তার গোটা জীবন তাকওয়ার পথে চালিত হতে পারে। কেউ কি বলতে পারবে যে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রোযার চেয়ে উত্তম কোনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্ভব? ইসলামী পদ্ধতিতে চরিত্র গঠনের জন্যে এ পদ্ধতির পরিবর্তে অপর কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রস্তাব করা সম্ভব কি?

আত্ম সংযম

প্রশিক্ষণ বিধির কড়াকড়িতে আবদ্ধ করার জন্যে শুধু দু'টি চাহিদা, অর্থাৎ যৌন চাহিদা ও উদর চাহিদাকে নির্বাচন করা হয়েছে। অবশ্য এর সাথে তৃতীয় একটি চাহিদা অর্থাৎ বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছাও এর আওতায় এসে যায়।

কেননা তারাবীহ্ নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সেহ্রীর জন্যে সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করে শেষ রাতে ওঠার কারণে বিশ্রামে যে ব্যাঘাত ঘটে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

যে কোনো প্রাণীর জীবনে এ তিনটি চাহিদাই মৌলিক ও বুনিয়াদী ভূমিকা পালন করে থাকে।

১. বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্যের দাবি।
২. বংশ রক্ষার জন্যে যৌন সম্পর্ক রাখার দাবি ।
৩. ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে বহাল করার জন্যে বিশ্রামের দাবি।

উপরোক্ত তিনটি প্রয়োজন পূরণের দাবি যাবতীয় জৈবিক কামনার উৎস এবং প্রাণীসুলভ সমস্ত তৎপরতার উদ্দীপক। এসব আবেদন এতোই শক্তিশালী যে, প্রাণী যাকিছু করে এসব শক্তির তাড়নায় বাধ্য হয়েই করে থাকে।

নিজের সেবা ও কর্ম সম্পাদনের হাতিয়ার হিসেবে মানুষকে যে উত্তম পাশবিক অবকাঠামোটি (শরীর) দেয়া হয়েছে তার মৌলিক চাহিদাও এই তিনটি। আর যেহেতু প্রাণীজগতে এই মানুষই হলো শ্রেষ্ঠতম প্রাণী, সুতরাং তার চাহিদাও হবে সর্বোচ্চ ধরণের। সে নিছক বাঁচার জন্যেই খাদ্য চায়না বরং সে চায় ভালো খাদ্য, রকমারী সুস্বাদু খাদ্য আহার্য উপকরণগুলো সুষম ও সুবিন্যস্ত হোক এটাও তার কাম্য। এই দাবি থেকে এতো বেশি শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয় যে, সেগুলো পূরণ করতে আরেকটি জগতের দরকার হয়ে পড়ে। মানুষ নিছক বংশ রক্ষার জন্যে যেনো তেনো প্রকারে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি করেনা। বরং এ দাবির মাধ্যমে শত সহস্র কমনীয়তা ও হাজার হাজার সূক্ষ্মতার উদ্ভব ঘটায়। সে চায় বৈচিত্র, চায় সৌন্দর্য, প্রত্যাশা করে আরাম আয়েশের অগণিত সাজ সরঞ্জাম। আনন্দদায়ক প্রেক্ষিত ও বিনোদনমূলক পরিবেশ তার কাম্য। মোটকথা এব্যাপারেও তার দাবির ডালপালা এতোবেশি যে, তা গণনা করা কঠিন। এভাবে মানুষের বিশ্রাম করার দাবিও সাধারণ জীব-জন্তুর মতো নিছক হারানো শক্তি ফিরে পাওয়া পর্যন্তই সীমিত নয়। বরং এ দাবির মধ্যেও রয়েছে অগণিত শাখা-প্রশাখা যার ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার নয়। সে কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তিই বহাল করতে চায়না বরং সে চায় শক্তি ক্ষয়ের সুযোগ যথাসম্ভব আসতে না দেয়া। কষ্টের প্রতি সে অনীহা দেখায়, বিনাশ্রমে কার্যোদ্ধার করতে সচেষ্ট থাকে। বিনা পরিশ্রম কিংবা ন্যূনতম শ্রমে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকে। বিশেষ করে জৈবিক উদ্দেশ্যের চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য হাসিলের জন্যে পরিশ্রম করা তো তার কাছে প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে এই তিনটি চাহিদার সমাবেশে কামনা বাসনার এমন একটি বিস্তীর্ণ জাল তৈরি হয়ে যায়, যা গোটা মানবজীবনকে আটকে ফেলতে চায়। কাজেই মানুষের এই সেবক এই উদ্ধত স্বভাবের পাশবিক সত্তার কাছে এই চাহিদা তিনটি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এই হাতিয়ার গুলোর দাপটে সে মানুষের সেবক হওয়ার পরিবর্তে মানুষকেই নিজের সেবক বানানোর চেষ্টা করে থাকে এবং সবসময় জোর দিতে থাকে যেনো তার ও মানুষের সম্পর্কের ধরন সঠিক ও স্বাভাবিক না হয়ে তার বিপরীত হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ এগুলোকে বশে আনার পরিবর্তে এগুলোই মানুষকে নিজের বশীভূত করে আপন খেয়ালখুশি মোতাবেক নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। যদি মানুষ সমগ্র শক্তি দিয়ে এগুলোর ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে এবং ইচ্ছা ও বিবেচনা শক্তিকে শিথিল করে ছেড়ে দেয়, তাহলে পরিশেষে ঐগুলো মানুষের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। নিজের সেবকের গোলাম এবং সেবক তার মনিব হয়ে আসে। বস্তুনিচয়ের সার্বিক জ্ঞান দানের মাধ্যমে যে নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন, চিন্তা ও গবেষণা, বশীভূতকরণ ও আবিষ্কারের যে যোগ্যতা তাকে প্রদান করেছেন, তার সবই উক্ত অন্ধ জাহেল, মূর্খ ও পাশবিক সত্তার সেবায় নিয়োজিত হয়। উচ্চমার্গে আরোহণ করার পরিবর্তে হীনতা ও দৈন্যতায় নেমে আসার কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়। সুউচ্চ মানবীয় লক্ষ্যের স্থলে নিকৃষ্ট পাশবিক লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়াররূপে তা ব্যবহৃত হয়। এগুলো শুধু একটি কাজেই ব্যবহৃত হয়, তাহলো দেহের জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্যে অহরহ নিত্যনতুন উপকরণ অনুসন্ধান করা। ফলে মানুষের আকৃতিধারী এই পশুটি গোটা প্রাণী জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত হয়। যে পশু নিজের ইচ্ছা আকাংখা পূরণের জন্যে মানুষের মতো একটি সেবক পেয়ে যায়, তার দুষ্কর্মের কোনো সীমা পরিসীমা থাকতে পারে কি? যে গরুর ক্ষুধা নৌবাহিনী গড়ার শক্তি অর্জন করে, তার গ্রোগ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি দুনিয়ার কোনো চারণভূমির থাকতে পারে কি? যে কুকুরের লালসা ট্যাংক ও বিমান তৈরির শক্তি পেয়ে যায়, তার সর্বনাশা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে এমন কোনো মাংসপিণ্ড ও হাড্ডি আছে কি? যে নেকড়ে তার বনের নেকড়েগুলোকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বলে ঐক্যবদ্ধ করার কৌশল জানে এবং যাবতীয় প্রচারযন্ত্র থেকে শুরু করে দূর পাল্লার কামান দিয়ে পর্যন্ত কাজ করতে সক্ষম, তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিকার সরবরাহ করার সাধ্য দুনিয়ার কারো থাকতে পারে কি? যে ছাগলের এতো ক্ষমতা যে, আপন কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে সে উপন্যাস, নাটক, ছায়াছবি, নাচগান, অভিনয় এবং সৌন্দর্যবর্দ্ধক বহু উপকরণ উদ্ভাবন করতে

সক্ষম, যার মধ্যে অনেক ছাগল বকরিকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে কলেজ, ক্লাব, সিনেমা পর্যন্ত বানানোর শক্তি আছে, তার ভোগবিলাসের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করার দায়িত্ব কে নিতে পারে?

অধপতনের এই অতল গহবরে পতিত হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে শুধুমাত্র তার সামনে মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য পেশ করা এবং তাকে মানবিক শক্তিসমূহ ব্যয় করার সঠিক খাত বলে দেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং তার সাথে এও জরুরি যে, এই পশুর সাথে তার সম্পর্কের স্বাভাবিক রূপ যা, তা বাস্তবায়িত করে দিতে হবে। অনুশীলন ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আরোহীকে এতোটা চৌকস বানাতে হবে যেনো, সে বাহনের উপর দৃঢ়ভাবে বসতে সক্ষম হয় এবং ইচ্ছার লাগাম দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারে। লাগামের ওপর তার এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতে হবে যে, বাহনটি নিজের ইচ্ছামতো যেদিকে টেনে নিয়ে যায় সেদিকেই সে চলে যাবেনা বরং নিজের ইচ্ছামতো বাহনকে সোজা ও সঠিক পথে চালাবে। এই জৈব দেহটি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন যাতে আমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি এবং জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে একে ব্যবহার করতে পারি। এর মস্তিষ্ক আমাদের জন্যে চিন্তা করার উপকরণ। এর ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ আমাদের জন্যে জ্ঞান অর্জনের উপকরণ। তার হাত পা আমাদের জন্যে চেষ্টা ও কাজের যন্ত্র বিশেষ। আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবীতে যতোগুলো বস্তু আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকারী বস্তু হলো এই পাশবিক দেহ। এর ভিতরে যতোগুলো সহজাত চাহিদা আছে তার সবগুলোই বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো পুরো করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের কাছে তার প্রাপ্য অধিকার এই যে, তাকে যেনো আরামে রাখি, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দেই, বংশ রক্ষার জন্যে তার দাবি পূরণ করি এবং তাকে অযথা নষ্ট না করি। বস্তুত আমাদের এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্যেই এর সৃষ্টি। তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে আমাদের আবির্ভাব হয়নি। বরং তাকে আমাদের ইচ্ছার অনুসারী ও অনুগত করতে হবে। আমাদের তার খেয়াল খুশির অনুগত হওয়া যাবেনা। সে এতোটা মর্যাদার অধিকারী নয় যে, একজন হুকুমদাতার মতো সে নিজের ইচ্ছাগুলোকে আমাদের দ্বারা পূরণ করিয়ে নেবে। বরং তার যথার্থ মর্যাদা এতোটুকু যে, সে তার চাহিদাগুলো একজন গোলামের মতো আমাদের সামনে তুলে ধরবে। আর আমাদের ভালোমন্দ বিচার ক্ষমতা ও পরিশীলিত স্বকীয়তার কাজ হলো, যখন যেভাবে যথাযথ মনে করবো, তার পেশকৃত দরখাস্ত সেভাবে পূরণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করে দেবো।

মানুষকে তার পাশবিক দেহের ওপর এই কর্তৃত্ব প্রদানই রোযার মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম। যে তিনটি চাহিদা সমগ্র পাশবিক চাহিদার উৎস, সে তিনটি হাতিয়ার এই পশুর কাছে এমন শক্তিশালী যে, এগুলোর জোরে সে আমাদেরকে তার বশীভূত করতে উদ্যত। রোযা এই তিনটিকে করায়ত্ব করতে সক্ষম এবং তার মুখে লাগাম লাগিয়ে লাগামের রশি আমাদের সেই স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত সত্ত্বার হাতে তুলে দেয়, যে আল্লাহর উপর সে ঈমান এনেছে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার অঙ্গীকার করেছে। রোযার সময়ে এই জন্তুটির অসহায় অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে খানাপিনা চাইতে থাকে অথচ আমরা তাকে কিছুই দেইনা। সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কিন্তু আমরা লাগাম কষে ধরি। সে খাবার দেখলেই তাতে মুখ দিতে চায়, কিন্তু আম'রা তাকে নড়তে দেইনা। অন্তত বিড়ি সিগারেট ও পান জাতীয় কিছু দিয়ে তার চাহিদা নিবৃত্ত করার মিনতি জানায় কিন্তু আমরা তার সে মিনতিও প্রত্যাখ্যান করে দেই। সে তার বিপরীত লিংগকে দেখে তার দিকে ধেয়ে যায় এবং আমোদ প্রমোদে মত্ত হতে উদ্যত হয় কিন্তু যখনই প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার প্রশ্ন উঠে অমনি আমরা তার লাগাম টেনে ধরি। এভাবে সারাদিন তার সব চাহিদা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে তাকে দানাপানি দেই। এবার এই ক্লান্ত দেহ কিছুটা বিশ্রাম নিতে উৎসুক হয়ে উঠে। কিন্তু এশার আযান শুনতেই তার কান ধরে দাঁড় করিয়ে সোজা মসজিদে নিয়ে যাই। অন্যান্য দিনে এশার জন্যে তাকে স্বল্প সময়ের নিমিত্তে দাঁড়াতে হতো। রমযান মাসে সাধারণ নামায ছাড়া তারাবীহর অসাধারণ কতকগুলো রাকাতের জন্যেও আমরা তাকে দাঁড় করিয়ে রাখি। এভাবে নাজেহাল হয়ে বের হয়ে বেচারা শোয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমে বিভোর থাকতে চায়। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে সে যখন সুখ নিদ্রায় মগ্ন তখন আমরা তার ওপর এমন এক চাবুক বসিয়ে দেই, যার দরুন তার সকল মত্ততা তিরোহিত হয়ে যায়। তারপর আমরা বলি, আমাদের প্রভুর নির্দেশ হলো দিনের পরিবর্তে এ সময় খানাপিনা করা সুতরাং যাকিছু খেতে চাও এ সময়ে খেয়ে নাও।

প্রতি বছর আমাদেরকে ত্রিশ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে করে আমাদের এই সেবকের উপর আমরা পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারি। যাতে আমরা নিজেদের দেহ ও শারীরিক শক্তিসমূহের প্রতাপশালী কর্তা ও হুকুমদাতা হতে পারি। যাতে পাশবিক চাহিদার স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। আমাদের মধ্যে এতোটুকু শক্তি সৃষ্টি হয় যে, আমাদের

বাসনাকে যে সীমানায় ইচ্ছা থামাতে পারি এবং শক্তিকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজে লাগাতে পারি। নিজের কামনা ও বাসনার মুকাবিলা করার যার আদৌ অভ্যাস নেই, প্রবৃত্তির প্রতিটি দাবির কাছে নতশির হওয়াতে যে অভ্যস্ত এবং যার কাছে পাশবিক প্রবৃত্তির আহ্বান অবশ্য পালনীয়, সে দুনিয়াতে কোনো মহৎ কাজ করতে পারেনা। বস্তুত উঁচু পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে মানুষের আত্মশক্তি এতোটা প্রবল হওয়া উচিত, যাতে সে নিজের ষড়রিপুকে বশে রাখতে সক্ষম হয় এবং মনমানসে আল্লাহ্‌র গচ্ছিত শক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। এ কারণেই রমযানের ফরজ রোযা ছাড়াও বছরের কেনো সময়ে মাঝে মধ্যে নফল রোযা রাখা পছন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে এই কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ জোরদার হতে থাকে।

ইসলাম রোযার সাধনা মানুষের স্বকীয়তাকে তার দেহ ও নফসের উপর যে কর্তৃত্ব দান করে আর অনৈসলামী পদ্ধতিতে রিপুবিনাশী সাধনা কিংবা ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত করার নামে যোগতপস্যা দ্বারা যে কর্তৃত্ব অর্জিত হয় অথবা পুণ্যবান লোকদের স্বতই যে কর্তৃত্ব অর্জিত হয়, এ উভয় প্রকারের কর্তৃত্বের মধ্যে বিরাট ও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অজ্ঞতাপ্রসূত ও যথেচ্ছাচারী অহংবোধের একনায়কত্ব, যা নিজের চেয়ে উর্ধের কোনো হুকুমদাতার অনুগত, কোনো উত্তম আইনের অনুসারী এবং কোনো সঠিক জ্ঞানের অনুগত হতে চায়না। আপন দৈহিক ও মানসিক শক্তির ওপর যে কর্তৃত্ব তার থাকে সেটাকে সে সঠিক উদ্দেশ্যে ও সঠিক পন্থায় প্রয়োগ করবে, এটা নিশ্চিত নয়। এমনকি সম্ভবও নয়। দুনিয়াতে সংসার ত্যাগ, সন্নাসব্রত ও বৈরাগ্যবাদের ব্যাধিসমূহ এ ধরনের কর্তৃত্বের দরুনই সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্তৃত্বের কারণেই দেহ ও মনের সমস্ত বৈধ অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এ ধরনের সামর্থের ওপর ভর করে মানুষ নিজেই আপন সহজাত চাহিদার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এ কর্তৃত্বের বদৌলতেই মানুষ তার যোগ্যতাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চমার্গে পৌঁছানোর পরিবর্তে অধপতন ও অধগতির নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এ কর্তৃত্বের ওপর ভর করেই দুনিয়ার অনেক লোক আল্লাহর অনেক বান্দার উপর স্বীয় প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং আপন শক্তি সত্য ও ন্যায়ের পরিবর্তে অসত্য ও অন্যায় পথে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে।

অপরদিকে ইসলামের রোযা দেহ ও নফসের ওপর যে স্বকীয়তাকে কর্তৃত্ব দেয় তা লাগামছাড়া স্বকীয়তা নয়। বরং সেটা হলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর আইনের শাসন অনুসরণকারী স্বকীয়তা। সেটা অজ্ঞতাদুষ্ট আত্মাভিমান নয়, স্বেচ্ছাচারী হয়ে চলার আত্মপ্রত্যয়ও নয়। বরং এমন আত্মোপলব্ধি যা

আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত জ্ঞানবিজ্ঞান ও সুষ্ঠু কিতাবের অনুসরণে চলার সহায়ক। সে আল্লাহ প্রদত্ত দেহ ও মনকে নিজের মালিকানা সম্পদ মনে করে বশে রেখে নিজের খেয়াল মুতাবিক যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তার ওপর কর্তৃত্ব করেনা। বরং সে তাকে আল্লাহর আমানত মনে করে এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এই আমানতের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর নিবেদিত অহংবোধ সম্পন্ন একজন মুমিন মুত্তাকী লোক স্বীয় দেহের জৈবিক অধিকার খর্ব করা এবং আল্লাহর বানানো তার আজীবন সাথীর ওপর সে যুলুম করা তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোনো বস্তুর ওপরই যুলুম করতে পারেনা। সে তাকে ভাল খাবার খাওয়াবে, উত্তম বস্ত্র পরিধান করাবে, সর্বোত্তম ঘরে বসবাস করাবে, সবচেয়ে বেশি আরাম দেবে, তার প্রতিটি স্বাভাবিক আবেগের প্রশান্তিদায়ক উপকরণের যোগান দেবে। নফস এরূপ কামনা করছে বলে নয়, বরং আল্লাহই তার এ অধিকার নির্ধারণ করেছেন। আর এই অধিকার আদায় করা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিশ্চিত উপায় বলেই এটা করা হয়।[১] অবশ্য এই নফসই যখন ভালো খাদ্যের জন্যে হারাম খানা কিংবা হারাম উপায়ে উপার্জিত জীবিকার বায়না ধরবে, যখন ভালো পোষাক, সুন্দর গাড়ি, মনোরম বাড়ির জন্যে আল্লাহর অপসন্দনীয় কলা কৌশল অবলম্বন করার দাবি করবে, যখন সে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যে আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে যেতে চাইবে, যখন সে আরামের অন্বেষণে আল্লাহর আরোপিত ফরজ ও কর্তব্য আদায় করতে অনীহা দেখাবে, যখন সে আল্লাহর রেজামন্দির জন্যে যেখানে নিজের ইচ্ছা ও নিজকে উৎসর্গ করা দরকার, সেখানে উৎসর্গ ও ত্যাগে বিরত থাকতে চাইবে সেক্ষেত্রে মুমিনের অহংবোধ তার শাসন ক্ষমতাকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রয়োগ করবে এবং তাকে ঔদ্ধত্য ও নাফরমানির পথ থেকে জোর করে ফিরিয়ে এনে আনুগত্যের সহজ সরল পথে নিয়ে যাবে। মুমিনদেরকে এ জিনিসগুলোর অভ্যাস রমযান মাসেই করানো হয়। যাতে করে দুনিয়ার এই

---

১. এর ভিত্তিতেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের প্রতি সদকাহ্ করো এবং আপন পরিবার পরিজনের প্রতিও সদকাহ করো, তারপর অন্যান্যদের প্রতি। নিজের প্রতি সদকাহ্ করা অথবা আপন পরিবার পরিজনের প্রতি সদকাহ করাটা একটি আশ্চর্য ধারণা বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চিন্তা পদ্ধতি দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে একেবারে ভিন্নতর। এখানে যে নিজের প্রবৃত্তির বাসনা অনুযায়ী খায় তার কেবল খাওয়াই সার হয়। কিন্তু যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হক মনে করে, নিজের বৈধ জীবিকা দিয়ে দেহকে খাদ্য দেয়, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে লালন পালন করে, সে প্রকৃতপক্ষে একটি পুণ্যের কাজে নিয়োজিত। প্রতিটি লোকমার পরিবর্তে সে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য।

পরিস্থিতিক্ষেত্রে যখন নাযুক অবস্থা উপস্থিত হয়, যা কিনা প্রতিদিনই উপস্থিত হয়ে থাকে তখন তার ইচ্ছার লাগাম এই উচ্ছৃংখল পশুটিকে বশে রাখতে যেনো অক্ষম না হয়।

ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত চিত্র

এ পর্যন্ত যাকিছু বলা হয়েছে তা ছিলো ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিয়। এবার রোযার সামষ্টিক দিকের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আগে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের এই কর্মসূচির প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো নেককার লোকদের এমন একটি সমাজ তৈরি করা, যে সমাজ মানবীয় সংস্কৃতিকে মংগল ও কল্যাণের ভিত্তিতে গঠন করবে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সে কেবলমাত্র সামষ্টিক নীতিমলা তৈরি করে এবং সেসব নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি সাংস্কৃতিক বিধি ব্যবস্থার জন্যে লোকদেরকে গঠন করার ব্যবস্থাও করে থাকে। যাতে সমাজবদ্ধ লোকগুলোর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা, চরিত্র ও কাজের দিক থেকে এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে এবং বিদ্রোহমূলক প্রবণতা লুকিয়ে রেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্যতামূলক আনুগত্য করার পরিবর্তে স্বীয় অন্তর ও আত্মার পূর্ণ আসক্তি নিজের হৃদয় ও মনের অবিচল বিশ্বাস এবং নিজ চরিত্রের আন্তরিক শক্তি দিয়ে তার অনুসরণ করতে পারে। এই পরিকল্পনার অধীনে[১] রোযার বিধান দিয়ে যেসব কাজ নেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি লোককে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় স্বেচ্ছাচারিতা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বিরত থাকার জন্যে তৈরি করা হয়, যাতে সে তার গোটা জীবনটাকে আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী করে গড়ে তুলতে পারে।

২. দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সম্যক জ্ঞাত হওয়ার বিশ্বাস এবং আখিরাতে জবাবদিহির আকীদা প্রতিটি মানুষের মনমগজে বাস্তব শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এমনভাবে বদ্ধমূল করে যে, বাইরের কোনো চাপে নয় বরং ব্যক্তিগত দায়িত্বানুভূতির ভিত্তিতে স্বতস্ফূর্তভাবে সে আল্লাহ্র বিধানকে গোপনে ও প্রকাশ্যে অনুসরণ করতে থাকে।

৩. প্রতিটি লোকের মধ্যে এমন চেতনা জাগ্রত করে তোলে, যাতে সে

---

১. এ কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, মুমিনের অবস্থা মুসা আ.-এর মায়ের মতো। আপন সন্তানকেই দুধ পান করালো, অথচ পেয়ে গেলো এর প্রতিদান। এভাবে মুমিন হক আদায় করলো নিজের, নিজের পরিবার পরিজনের, অথচ তাতে সে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হচ্ছে।

চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগি ও আনুগত্য করতে অস্বীকার করে এবং বন্দেগি আল্লাহ্‌র জন্যে এমনভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় যে, যে হুকুম অথবা যে বিধান কিংবা যে কর্তৃত্বের কোনো দলিল তার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়না, তার অনুসরণের জন্যে একজন মুমিনের অন্তর ব্যক্তিগতভাবে মোটেই প্রস্তুত থাকেনা।

৪. প্রতিটি লোককে নৈতিক শিক্ষা এমনভাবে দেয়া হয়, যাতে সে তার ইচ্ছার ওপর কার্যত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। সে তার দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে যেনো এতোটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় যে, সে নিজের জ্ঞান, বিশ্বাস ও দূরদর্শিতা অনুযায়ী তা কাজে লাগাতে পারে। তার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, উদ্যমশীলতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। তার চরিত্র এতোটা শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, সে বাইরের কুপ্ররোচনা এবং নিজের নফসের অবৈধ আসক্তির মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ইসলাম রমযান মাসের রোযা এমন প্রতিটি লোকের ওপর ফরজ করেছে যে, ইসলামী সমাজের সদস্য-প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন স্ত্রী কিংবা পুরুষ কেউ এ ফরজ থেকে মুক্ত নয়। অসুস্থতা, সফর ও অন্যান্য শরয়ী ওজরবশত কেউ রোযা রাখতে অক্ষম হলে, তার ওপর কাযা অথবা ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব। বস্তুত ইসলামের গন্ডিতে থেকে কেউ রোযার কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেতে পরেনা।

একথা সত্য যে, রোযার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে চায়, তার সবগুলো পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রত্যেক রোযাদারের মধ্যে সৃষ্টি হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কেননা ঐ গুণাবলীর সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভ স্বয়ং রোযাদারের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতার ওপরও অনেকটা নির্ভরশীল। তথাপি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে স্বভাবতই মানব সত্তায় এসব গুণের সমাবেশ ঘটানোর অসাধারণ ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। এ জন্যে এর চেয়ে উত্তম বা এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তাও করা যায়না। যদি কেউ সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ গড়ার এমন ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী কর্মসূচি, যার আওতায় এসে সমগ্র জনবসতি আপনা থেকেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে, যা ইসলাম ছাড়া আর কোনো সমাজ ব্যবস্থা দিতে পারেনি।

এ কর্মসূচির আরো একটি বৈশিষ্ট হলো, এই সমাজের গন্ডিতে এর অংশ হিসেবে অবস্থান করার অযোগ্য কোনো লোকের আবির্ভাব হলে সে নিজেই

ভিন্নরূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। একটি লোক রোযা রাখলোনা অথচ তার কোনো যুক্তিসংগত কারণও নেই কথাটি সমাজের লোকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা বলাবলি করতে থাকে যে, তাদের এখানে একজন মুনাফিক আছে, সে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেনা সে নিজের পাশবিকতা ও পৈশাচিকতারই গোলাম হয়ে থাকতে চায়। এই প্রকাশ্য আলামতের মাধ্যমে সমাজ তার দেহে একটি পঁচা অংশের উপস্থিতি সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হয়ে এ বিষক্রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পায়। মুনাফিকদের চিহ্নিতকরণে ইসলাম অন্তত তার সাধ্যানুযায়ী পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি মুসলিম সমাজকে একথা বুঝার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে যে, সমাজে এ ধরণের মুনাফিকদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলে এদেরকে সংশোধন করতে হবে অথবা এদেরকে সমাজের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে হবে। এখন কোনো চেতনাহীন নামসর্বস্ব মুসলিম সমাজ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে এবং এমন প্রকৃতির লোকদেরকে শুধুমাত্র নিজের ক্রোড়ে রেখে লালন পালনই করেনা বরং নেতার আসনে বসিয়ে তার সমর্থনে জিন্দাবাদ শ্লোগানও দেয়, তবে সেটা ভিন্নকথা।

রোযার সামাজিক দিক

নামাযের মতো রোযাও মূলত একটি ব্যক্তিগত কাজ। কিন্তু নামাযের সাথে জামায়াতের শর্ত আরোপ করে যেভাবে ঐ একক ও ব্যক্তিগত কাজকে সামাজিক কাজে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেভাবে রোযাকেও একটিমাত্র প্রজ্ঞাময় ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তিগত কাজের পরিবর্তে সামাজিক কাজের রূপ দিয়ে এর উপকারিতা ও ফায়দাকে সীমাহীন করে দেয়া হয়েছে। রোযার জন্যে একটি নির্দিষ্ট মাস নির্ধারণ করাই সেই সুনিপুণ প্রাজ্ঞ ব্যবস্থা। শরীয়ত প্রবর্তকের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র মানুষের নৈতিক শিক্ষাই যদি কাম্য হতো, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানকে বছরের যে কোনো সময়ে ত্রিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেয়াই যথেষ্ট হতো। আর এভাবেই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী লাভ করা যেতো। বরং আত্মসংযমের অনুশীলনীর জন্যে এ ব্যবস্থাই হতো সবচেয়ে মানানসই। কারণ সমাজের সকলে একত্রে রোযা রাখার কাজটা জনগণের জন্যে যেরূপ সহজ হয়ে যায়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দিলে তদ্রূপ হয়না। ব্যক্তিগতভাবে করা হলে প্রত্যেকটি লোককে তার নিজের ফরজ আদায় করার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তি দিয়ে স্বীয় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হতো। কিন্তু ইসলামের বিধান যে বিজ্ঞ

প্রকৌশলীর তৈরি, তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্তির এমনভাবে তৈরি হওয়াটা এমন কোনো কাজ নয়, যার ফলে একটি নেককার দল না গড়ে উঠতে পারে। এজন্যে তিনি রোযাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কাজ বানানো পছন্দ করেননি। বরং সারা বছরের একটি মাসকে রোযার মধ্যে নির্ধারিণ করেছেন, যাতে সমগ্র মুসলমান জাতি একই সময়ে রোযা রেখে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদেরকে গঠন করার সাথে সাথে একটি কল্যাণকর সামাজিক পদ্ধতি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে।

এই সুবিজ্ঞ কৌশল অবলম্বন করার কারণে রোযার যে বাড়তি নৈতিক ও আত্মিক ফল পাওয়া যায়, তার প্রতি এখানে সংক্ষেপে ইংগিত করা যাচ্ছে।

তাকওয়ার পরিবেশ

সামষ্টিক কাজের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট হলো, এর ফলে বিশেষ এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থার অধীনে কোনো কাজ করছে, অথচ তার চারপার্শ্বে অন্যান্য লোকদের মধ্যে এই মানসিক অবস্থাও নেই এবং তারা একাজে শরীকও নয়, এমন পরিবেশ ঐ লোকটির নিজকে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা মনে হবে। তার মানসিক অবস্থা শুধু তার সত্তা পর্যন্ত সীমিত এবং কেবলমাত্র তার স্বকীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকবে। তার মানসিক অবস্থার বিকাশের জন্যে এমন পরিবেশ তার কোনোই কাজে আসেনা। বরং পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে সে অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ পরিবেশকে এ অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেলে, সমগ্র মানুষ যদি একই ধারণা ও একই মানসিকতার অধীনে একই কাজ করতে থাকে, তাহলে সেটা হবে ভিন্ন ব্যাপার। সে সময় এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যে পরিবেশ গোটা সমাজকে একাকার করে দেবে এবং প্রতিটি লোকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবেশের বাহ্যিক সহায়তায় পরিপুষ্ট হয়ে বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। ভেবে দেখুন তো, চারপাশের বস্ত্র পরিহিত লোকদের মাঝে একজন মাত্র লোকের বিবস্ত্র থাকা কতো বড় লজ্জাকর ব্যাপার? এ ক্ষেত্রে বিবস্ত্র হওয়ার জন্যে বেহায়াপনার কিরূপ চরম সীমায় পৌছা তার জন্যে দরকার হবে এবং তারপরও পবিবেশের বিভিন্নতার প্রভাবে তার এই চরম বেহায়াপনাও কিভাবে বারবার পরাজিত হবে? কিন্তু একটি স্নানাগারে যদি সকলেই উলংগ হয়, তবে সেখানে কারো লজ্জার বালাই থাকবেনা। বরং প্রত্যেকের লজ্জাহীনতা অপরাপর সকলের লজ্জাহীনতার সহায়তায় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। একেকজন সৈনিকের

ভিন্ন ভিন্নভাবে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা বরদাশত করা কতো বড় কঠিন কাজ। কিন্তু যেখানে সেনাবাহিনীর সম্মিলিত মার্চ হচ্ছে সেখানে শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের এক প্রচণ্ড সয়লাব আসে, সেখানে প্রতিটি সৈন্য উন্মাদের ন্যায় ছুটতে থাকে। খারাপ হোক কিংবা ভালো, উভয়ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে সামাজিক মনস্তত্ত্বের একটি অসাধারণ দখল রয়েছে। সমাজ সম্মিলিতভাবে খারাপ কাজ করতে থাকলে পাপাচার, বেহায়াপনা ও অন্যায়ের প্রভাব দুর্দম হয়ে উঠে। আবার সমাজ দলবদ্ধভাবে ভালো কাজ করতে থাকলে সুস্থ ধারণা ও সৎ কাজের স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এর ফলে অসৎ লোকও সৎ হয়ে যায়। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও।

রমযান মাসটিকে সামস্টিক রোযার মাস ঘোষণা করে শরীয়ত প্রবর্তক এ কাজটিই করেছেন। আপনারা দেখে থাকেন, প্রতিটি ফসল যেভাবে তাদের নিজস্ব মৌসুমে ফুলে ফলে ভরে উঠে, তাতে চতুর্দিকে শষ্যক্ষেত্রে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেভাবে রমযান মাস যেনো মংগল ও কল্যাণ এবং পবিত্রতাও তাকওয়ার মৌসুম। এ মৌসমে অন্যায় অবিচার দমে যায়। নেক ও সৎ ফুলে ফলে সশোভিত হয়, আল্লাহভীতি ও কল্যাণপ্রীতির ভাবধারা গোটা জনবসতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সবদিকে পরহেজগারীর ক্ষেত্রে শ্যামল শস্যের সমাবেশ দেখা দিতে থাকে। এ সময়ে গুনাহর কাজ করতে লোকেরা লজ্জা পায়, প্রতিটি লোক গুনাহ থেকে বাঁচার জন্যে নিজেই চেষ্টা করে এবং তার অন্য কোনো ভাইকে গুনাহ করতে দেখলে লজ্জা দেয়। এ সময় প্রত্যেকের মনে কোনো না কোনো ভালো কাজ করা, কোনো গরীবকে খানা খাওয়ানো, কোনো বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা, কোনো বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, কোথাও নেক কাজ হতে থাকলে সেখানে অংশ গ্রহণ করা কিংবা কোথাও অশুভ অন্যায় কাজ হতে দেখলে তা প্রতিহত করার বাসনা হয়। এ সময়ে মানুষের মন নরম হয়ে যায়। যুলুম অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়, ভালো ও নেকের প্রতি আগ্রহ এবং অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তওবা, ভয় ও খোদাপ্রীতির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক সৃষ্টি হয়। সৎ লোকেরা আরো বেশি সৎ হয়। অসৎ লোকের অসততা যদিও সততায় পরিণত না হয়, তবুও এই আত্মশুদ্ধির সর্বব্যাপী কর্মকাণ্ডে তার কিছুটা চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যায়। মোটকথা এই মহান বিজ্ঞচিত কৌশল দ্বারা শরীয়ত প্রবর্তক এমন একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে প্রতি বছর এক মাসের জন্যে গোটা ইসলামী জনতা পরিচ্ছন্ন হতে থাকে, তাকে উপরে টেনে আনতে থাকে, তার অবকাঠামো পাল্টিয়ে দেয় এবং

সামগ্রিকভাবে তার মধ্যে নতুন করে ইসলামী উদ্দীপনার সঞ্চার করা হয়। একারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين.

অর্থ ঃ যখন রমযান আসে তখন বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করা হয়, শয়তানদেরকে শৃংখলিত করা হয়।'

অপর একটি হাদিসে আছে ঃ

اذا كان اوّل ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت الابواب النارفلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناديا باغى الخير اقبل قبل ويا باغى الشرّا قصر.

অর্থ ঃ রমযানের প্রথম রাত্রি আগমনের সাথে সাথেই সকল শয়তান এবং অবাধ্য জ্বিনদেরকে বেধে ফেলা হয়। দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, একটিও খোলা থাকেনা। বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং তার একটিও বন্ধ থাকেনা। এসময়ে একজন ঘোষক আহবান করে, 'হে কল্যাণ সাধনকারী অগ্রসর হও, আর হে অন্যায়কারী পাপিষ্ঠ একটু থামো।'

নাকের কাছে আয়না রেখে মুর্ছা যাওয়া রোগীর শেষ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আয়নায় কিছু ঝাপসা ভাব দেখা দিলে বুঝা যায় জীবন এখনো অবশিষ্ট আছে। অন্যথায় তার জীবনের শেষ আশাও খতম হয়ে যায়। এভাবে মুসলমানের কোনো বসতিকে পরিক্ষা করতে চাইলে রমযান মাসে তাদেরকে দেখুন। এমাসে তাদের মধ্যে কিছুটা তাকওয়া, কিছু আল্লাহভীতি, কিছু নেক কাজের আগ্রহ দেখলে বুঝতে হবে এখনো তাদের মধ্যে জীবনী শক্তি আছে। আর এ মাসেও যদি নেকীর বাজার মন্দা হয়, অন্যায় অবিচারের আলামত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং চেতনা নিষ্প্রভ দেখা যায়, তাহলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে হবে। এরপর মুসলিম জীবনের আর কোনো আশা মুসলমানের থাকেনা।[১]

---

১. এটা তো পরিক্ষার জন্যে ইসলামী মাপকাঠি। কিন্তু বর্তমানে এই পরিক্ষার অন্য মানদণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। মুসলমানদের কোনো দেশ পরাধীন হলে তার পরিক্ষা হয় জাতীয় স্বার্থের (অর্থাৎ জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ) জন্যে তার মধ্যে অস্থিরতা আছে কতোটুকু তার মাধ্যমে। এই স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে তার

সংঘবদ্ধতার অনুভূতি

সম্মিলিত কাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হলো, এর ফলে লোকদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সত্যিকার একতা সৃষ্টি হয়। বংশ অথবা ভাষা, মাতৃভূমি কিংবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হলে স্বাভাবিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়না, কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা ও কাজের মধ্যে মিল থাকলেই মানুষের মনের মিল হতে পারে। দু'জন লোককে একই সূত্রে গাঁথার এটাই প্রকৃত উপায়। কাজ ও ধ্যান ধারণার ঐক্য না থাকলে মনের দিক থেকে একতা থাকতে পারেনা, যদিও উভয়েই সহোদর ভাই হোক না কেন। যখন কোনো ব্যক্তি তার চারপাশের লোকদের মানসিকতা ও কাজকে নিজের থেকে ভিন্নরূপে দেখতে পায়, তখন সে নিজেকে সেখানে সম্পূর্ণ একাকী ও অসহায় মনে করে থাকে। কিন্তু যখন অনেক লোক একত্রিত হয়ে একই মনমানসিকতা সহ একই কাজ করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব, একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে মনোভাবের অমিল আর অবশিষ্ট থাকেনা। মন ও আত্মার সংমিশ্রণ এবং কাজের ঐক্য তাদেরকে পাস্পারিকভাবে একত্রে জুড়ে দিয়ে থাকে।

নেক কাজ হোক কিংবা অসৎ কাজ, উভয় অবস্থাতেই সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব এভাবেই কাজ করে থাকে। চোরদের চুরি করতে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং মদখোরদের মদপান করতে সংঘবদ্ধ হওয়াও এ ধরণের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে থাকে। তবে পার্থক্য হলো খারাপ কাজের মধ্যে অহংকারের সংমিশ্রণ থেকে যায়, যার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে সমাজের মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার দিকে। এ কারণে এ ধরণের ভ্রাতৃত্ব কখনো স্বচ্ছন্দ ও সুদৃঢ় হয়না। পক্ষান্তরে নেকীর রাস্তায় অহংকার দমে যায়। মানবীয় আত্মা প্রকৃত শান্তি পায় এবং নির্দোষ মানসিকতা নিয়ে মানুষ এ রাস্তায় চলতে থাকে। এজন্যে নেক ধারণাসমূহ এবং নেক কাজের মিলন সর্বোত্তম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলে। এর চেয়ে সুদৃঢ় মজবুত সামাজিক সম্পর্ক কল্পনাও করা যায়না।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা কতোটুকু, সভা সমিতিতে ইসলাম ও ইসলামী জাতীয়তাবাদের নাম কতো বড় আবেগ উদ্দীপনার সাথে নেয়া হয়। আর সে দেশ যদি হয় মুক্ত স্বাধীন, তাহলে তার জীবনের পরিক্ষা হয়। সে উড়োজাহাজ তৈরি করেছে কতোটি, রেলগাড়ি বানিয়েছে কয়টি। বিদ্যালয় এবং কারখানা কি পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বীয় নারীদেরকে বেহায়াপনায় কতোটুকু অগ্রসর করতে পেরেছে। সভ্যতা ও সামাজিকতায় ইউরোপের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে কতোটুকু সফলতা অর্জন করেছে। এসব পরিক্ষায় কেউ সম্পূর্ণ সফলকাম হলে সে স্বগৌরবে বলে উঠে, **আলহামদুলিল্লাহ**। ইসলাম জীবিত আছে। (নাউযুবিল্লাহ)

জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার মতো রমযানের সামষ্টিক রোযাও মুসলমানদের মধ্যে একই ধরণের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। সমস্ত লোক মিলে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট সহ্য করা, তাঁরই ভয়ে সমস্ত অন্যায় পরিহার করা এবং একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা, তাঁরই মহব্বতে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া, একে অপরকে মঙ্গলজনক কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা, এসব জিনিস তাদের মধ্যে উত্তম ধরণের একত্ব, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক জাতীয়তা, পবিত্রতম সম্মিলিত মানসিকতা এবং এমন সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, যা সর্ববিধ কৃত্রিমতা ও কলুষতামুক্ত।

পারস্পারিক সহযোগিতার মানসিকতা

এই সামাজিক ইবাদতের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, এ বিধান সাময়িকভাবে সমস্ত মানুষকে একই সমতলে নিয়ে আসে। যদিও ধনী ধনীই থাকে, গরীব গরীবই রয়ে যায়। তথাপি কয়েক ঘন্টার জন্যে ধনীকেও এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করে, যে অবস্থা একজন ভুখানাংগা ভাইয়ের ওপর আপতিত হয়ে থাকে। ফলে সে গরীব লোকটির মুসিবতকে সত্যিকারভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার মনোভাব তাকে গরীব ভাইটিকে সাহায্য করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। বাহ্যত এটা খুবই তুচ্ছ কথা মনে হয় কিন্তু এর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফায়দা অগণিত। যে জাতির আমির ওমরাহগণের মধ্যে গরীবদের দুঃখ কষ্টের অনুভূতি এবং তাদের জন্যে বাস্তব সহযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান থাকে, যেখানে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয়া হয়না, বরং বাড়ি বাড়ি সন্ধান চালিয়ে অভাবগ্রস্তের কাছে সাহায্য পৌঁছানো হয়। সেখানে জাতির কেবলমাত্র দুর্বল শ্রেণীই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়না, শুধুমাত্র সামষ্টিক কল্যাণই টিকে থাকেনা, বরং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা ও মহানুভবতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে। সেখানে কখনো শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিতে পারেনা। যে জাতির ধনিক শ্রেণী ক্ষুধা অনাহার বস্তুটি কি তাও জানেনা, যারা দুর্ভিক্ষের সময়ে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে কেন? তারা ভাত না পেলে পোলাও খাচ্ছেনা কেন?' বস্তুত এমন জাতির মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দেয়।

এটা হলো ইসলামের দ্বিতীয় কার্যকর রুকন। এই বিধানের মাধ্যমে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশেষ ধরণের নৈতিক

শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে থাকে। তারপর তাদেরকে একত্রিত করে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সমাজ গঠন করে। ইসলামের যে মূল লক্ষ্য আল্লাহভীরু ও সুনাগরিক তৈরি করা, তা গঠন করার উপাদানগুলোকে এভাবে নামায রোযার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এখানকার আমলা, কর্মকর্তা, মন্ত্রীবর্গ এবং শিক্ষক, অধ্যাপক, বিচারক, মুফতি, এখানকার ব্যবসায়ী, শ্রমিক কারিগর, কৃষক, ভোটার, গণপ্রতিনিধি এবং নাগরিক সকলেই এই শিক্ষার ফলে এমন যোগ্য হয়ে উঠে যে, তাদের মহামিলনে সেই কল্যাণকর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতি তৈরি হতে পারে, যাকে 'খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুয়্যত' বা নবুয়্যতের আদর্শ অনুসারী খেলাফত নামে অভিহিত করা হয়েছে। খেলাফতে ইলাহীয়া কায়েম করার জন্যে শুধুমাত্র অযোগ্য ও অথর্ব লোকদেরকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ, যা থেকে আল্লাহর রসূল ছিলেন মুক্ত ও পবিত্র।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক শিক্ষার প্রোগ্রাম এখানেই শেষ নয়। এর সাথে রয়েছে যাকাত নামের তৃতীয় একটি কার্যকর রুকন। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো ইনশাআল্লাহ।